দ্বিতীয় অধ্যায়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প জীবনোপলব্ধির স্বরূপ ও শিল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্য ঘরে অন্য স্বর

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর*-এর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পটিকে কিছুটা পৃথক ও আকস্মিক বলে মনে হয়। কারণ, তাঁর প্রথম চারটি গল্পগ্রন্থের আঠারোটি গল্পের মধ্যে সতেরোটি গল্পই পাঠককে নানা ধরনের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। একজন পাঠক জীবনে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন বটে, তা সত্ত্বেও অনেক কিছুই তাঁর অজ্ঞাত থেকে যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই, এমন অনেক ঘটনাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের বিষয়। গল্পগুলো আমাদের ভয়াবহ বাস্তবতার সন্ধান দেয়। আমরা আহত হই, কিন্তু সেগুলোকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারি না; ধীরে ধীরে সেসব আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। তাঁর নির্মোহ-নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ও নিরাবেগ ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি কতিপয় নির্মম-নিষ্ঠুর সত্যকে নির্মমতম করে তোলে। মানুষের প্রকৃত জীবনই ইলিয়াসের আরাধ্য। সে কারণে, সেই জীবনে যা নেই, তাকে রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার মোড়কে উপস্থাপন করতে তিনি নারাজ। তাঁর গল্পে জীবন তার আপন রূপে উন্মোচিত; গল্পের চরিত্রগুলো সমবেত জনগোষ্ঠীর প্রতীক। কেউ নায়ক নয় তাঁর গল্পে। কোনো চরিত্র আলাদা গুরুত্ব পেলেও সমষ্টির একজন হয়েই পায়, তার ওপর প্রথাগত কোনো নায়কোচিত মহত্ত্ব বা

গুরুত্ব আরোপিত হয় না। তবে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে লেখক অন্যান্য গল্পের মতো ততটা নিরাবেগ নন। ভাষাও কিছুটা কাব্যগন্ধী, তবু নিরুত্তাপ ভাষায় নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি যে গল্পের ভুবন সৃষ্টি করবেন, এ গল্পে তার ইঙ্গিত রয়ে গেছে। তাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে।

মেমোরি-মর্মরিত রোগা-অসুস্থ ও কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ রঞ্জু বাবা-মার ঘরে কী যেন ফেলে এসেছে। ফেলে আসা বস্তুটি মাঝরাতে বাবা-মার ঘরে পাওয়া যায় না। বৃষ্টিভেজা রাতে তার ঘুম আসে না। পরে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির বিপদসংকেত শুনে সে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। দেখা হয় পুলিশ কনস্টেবলের সঙ্গে, সে রঞ্জুর বাপ-দাদার ইতিহাস বর্ণনা করে। সেই জন্মের আগের সময়েও যেন সে কিছু ফেলে এসেছে। ধীরে ধীরে সে একাকী শহর শেষ করে নদীতীরে চলে আসে এবং শিমুলগাছের তলায় শুয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয় এবং শিমুলগাছের মস্ত একটা ডাল রঞ্জুর গায়ে এসে পড়ে—সে মারা যায়।

এই গল্প থেকেই ইলিয়াসের নিজস্ব কথনভঙ্গির সূত্রপাত। অনেকের রচনায়, চরিত্রের সংলাপেও লেখকের প্রচ্ছন্ন-প্রত্যক্ষ উপস্থিতি থাকে; এখানে লেখকের মধ্যে চরিত্র ঢুকে পড়ে বক্তব্যকে বাস্তব ও মর্মস্পর্শী করে তোলে।

গল্পটির শুরুতে সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী এক স্তবকে লেখক কথা বলেছেন নিজেই। প্রথম বাক্যই তাঁর গল্পের আবহ সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ : 'এই মনোরম মনোটোনাস শহরে অনেকদিন পর আজ সুন্দর বৃষ্টি হলো।' (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১) এ জন্য তার ভালো লাগে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, এটি কেবল ভালো লাগা নয়, সন্নিহিত বিপ্রতীপ সমকালে আত্মধ্বংসের প্ররোচনাও। কারণ, এ বৃষ্টি অন্য রকম; 'বৃষ্টি একজন অচিন দীর্ঘশ্বাস।' তার মধ্যে চিনচিন করে ওঠে কোনো ব্যথা নয়, ব্যথার সমান্তরাল স্মৃতি। মনে পড়ে : "কতোদিন আগে ভরা বাদলে আশিকের সঙ্গে আজিমপুর থেকে ফিরলাম সাতটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে; 'তুই ফেলে এসেছিস কারে'।" সাতটা রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে 'তুই ফেলে এসেছিস কারে' গানটির কথা উল্লেখের কারণ, ফেলে আসা দিনগুলোর জন্য স্মৃতিকাতরতা। তখন সেই সোনার শৈশবে ভুল করে দেখা একটি স্বপ্ন চেতন মনেও স্বপ্নের মতো টলটল করে। গল্পের দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম বাক্য : 'আম্মার ঘরে যাবার জন্য রঞ্জু উঠে দাঁড়ালো', এখানে পূর্বোক্ত উত্তম পুরুষ রঞ্জুতে রূপান্তরিত। শুরুতে লেখক নিজেই উপস্থিত থেকে, অনুভূতিগুলোর কেন্দ্রে থেকে, সেসব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে শুরুতে যে ব্যক্তির অনুভূতির বিস্তার দেখেছি, তাকে অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ মনে হয় না। কিন্তু

ছোটো ছোটো ছায়া ফেলে দুর্গার সঙ্গে অপু রেললাইন দেখতে কতদূর পাড়ি দিচ্ছে। দুর্গা সিঁদুরের কৌটা চুরি করে তাকের ওপর লুকিয়ে রেখেছিলো বলে রঞ্জুর মন খারাপ। 'দিদি তুই সিঁদুরের কৌটা চুরি করলি কেন?' (পৃ-৭)

এখানেও স্মৃতিকল্পনাটি শেষ হয় না। কিন্তু লেখক এই স্মৃতিকল্পনা ও শহরের বাস্তবতার মাঝখানে আমাদের দাঁড় করান। স্মৃতিকল্পনাটি ব্যাখ্যার সূত্রগুলো আমরা পেয়ে যাই, কিন্তু রঞ্জু তার স্মৃতিকল্পনা থেকে ফিরতে পারে না :

দুর্গাকে শুধোবে বলে রঞ্জু সামনের দিকে সোজা স্পষ্ট তাকালো, দেখলো, অন্ধকার ও জলের মধ্যে নিশ্চিন্তপুর অতলে ডুবে গিয়েছে। ল্যাম্পোস্টে ঠেস দিয়ে দুর্গা রঞ্জুকে ভারি সময়হীন তাকাচ্ছে। দুর্গার শরীর একটি নিপুণ প্রতিমা হয়ে রঞ্জুর সমস্ত স্মৃতিকে গেঁথে রেখেছে। রঞ্জু উদ্বেল বুকে কলকল করে উঠলো, 'দিদি!' (পৃ-৭)

অন্ধকার ও জল সমকালের প্রতীক হয়ে ওঠে, তাতে নিশ্চিন্তপুর নয়, রঞ্জুর শৈশব, তার যাবতীয় ভালো লাগা ও সরলতাই ডুবে গেল মূলত। অস্ফুট 'দিদি' উচ্চারণের মধ্যে তার এই হাহাকার বেজে উঠেছে।

নিশ্চিন্তপুরের অপু-দুর্গার বর্ণনায় মোহগ্রস্ত পাঠককে 'ল্যাম্পোস্ট' শব্দটি দ্রুত নগরে নিয়ে আসে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা হলো, তিনি মোহগ্রস্ত করতে চান না, মোহ কাটাতে চান বাংলা গল্পের পাঠকদের। এমন সব গল্প রয়েছে তাঁর, যেগুলো পাঠ করলে পাঠকের আর মোহগ্রস্ত হওয়ার শক্তিই থাকে না।

রঞ্জুর উদ্বেল বুকে 'দিদি' শব্দটি কলকল করে ওঠার পর ইলিয়াস এমন একটি বাক্য লেখেন, যেটি ঘটনার যৌক্তিক পারম্পর্যই শুধু ধরিয়ে দেয় না, রঞ্জু যা খুঁজে ফিরছে, তা পাওয়ার সম্ভাবনাকেও নস্যাৎ করে দেয় :

তখন প্রচণ্ড নির্বাক, নিস্পন্দ, সাংঘাতিক আতঙ্কে ওর গলা লম্বা হয়ে গেলো, শিরদাঁড়া বেয়ে স্রোতহীন দাঁড়িয়ে পড়লো শীতল প্রাণহীন রক্ত; কতোকাল হলো দুর্গা মারা গিয়েছে! (পৃ-৭)

অপুর দিদি, রঞ্জুর স্মৃতির দুর্গা অনেক কাল আগে মারা গিয়েছে—এই তথ্য আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ, কিন্তু অসুস্থ, স্মৃতিকাতর রঞ্জুর জন্য সংকটবহুল বৃষ্টিবাদলের রাতে এই সাধারণ তথ্যটিই তাৎপর্যপূর্ণ, অসাধারণ হয়ে উঠেছে। দুর্গার মৃত্যুর পর অপু ট্রেনে চেপে—যে ট্রেন দেখার জন্য দুর্গার সঙ্গে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে গিয়েছিল—শহরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। দুর্গা শহরে নেই; নিশ্চিন্তপুর গ্রামেও নেই। অপু শুধু দুর্গাকে হারায়নি, হারিয়েছিল নিশ্চিন্তপুর গ্রাম, তার স্বপ্নময় শৈশব; তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল প্রজন্মান্তরের নাগরিক

একদিন ছড়ার ছবির বই পড়ার সময় মা যখন জর্জেটের শাড়ি পরতেন, ছবির বইয়ের গন্ধে রঞ্জুর ঘুম আসত। জর্জেটের শাড়ি পরে বাবার সঙ্গে মা যখন সিনেমা দেখতে যেতেন, সেই শাড়ির গন্ধে আবার ঘুম ভাঙত। এখন মা সিনেমায় যান না, জর্জেটের শাড়ি পরেন না। ইঙ্গিতগুলো সময়ের ব্যবধানকে, পরিবর্তনকে স্পষ্ট করে। কথোপকথন, নানা ঘটনা এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আমরা যতই সময়ের দ্রুত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি, ততই আক্রান্ত হই তাতে এবং রঞ্জুর শৈশবপ্রীতি, স্মৃতিকাতরতা আর শৈশব খুঁজে ফেরার আকুলতার সঙ্গে একাত্ম হই।

গল্পের বর্ণনায় লেখকের আবার অনুপ্রবেশ ঘটে। বলা দরকার, অনুপ্রবেশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারও সর্বনাশের খবর ছড়িয়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি চলে যাওয়ার পর—

> কেমন হতাশ চিত্তে ও বাইরে এসে দাঁড়ালো। ঘর থেকে নীল আলোর একটুখানি এখানে এসে পড়েছে; আকাশে কালো মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, গাছপালায় ভিজে অন্ধকার ছিপছিপে ছড়ানো; এই আলো ও আঁধারিতে, এই নীরব নিসর্গে ছমছম ভয় করে আমার। (পৃ-৭)

বৃষ্টি শেষে রাতের সেই পরিবেশ বর্ণনা রঞ্জুর পক্ষে অস্বাভাবিক হতো, কিন্তু এই আবহ সৃষ্টি করা না গেলে ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে *পথের পাঁচালী*র দুর্গা দাঁড়াতে পারবে না। তাই লেখক গল্পের বহিরঙ্গে ঢুকে রঞ্জুকে দেখতে এবং দেখাতে লাগলেন। আবার আলো-আঁধারিতে রঞ্জুর প্রতিক্রিয়া বোঝানোর জন্য এই স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করে রঞ্জুর ভয়ের স্বীকারোক্তি দিলেন। যদিও লেখক যেখানে পরিবেশ বর্ণনা করেছেন, সেখানে 'আমার' শব্দটির ব্যবহার আকস্মিক মনে হওয়ার অবকাশ থেকে যায়, তবু পরের স্তবকেও লেখকের নিজের বর্ণনা 'আমার' শব্দটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের উপরিউক্ত ব্যাখ্যাকে যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখকের নিজের অংশগ্রহণ, অর্থাৎ গল্পকথনের ভঙ্গির পরিবর্তন আরও একটি কারণে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেটি হলো, শিমুল ফুলের ঘ্রাণ নিতে গিয়ে রঞ্জুর নিঃশ্বাস শেষ হয়ে আসবে। সেই বাস্তব-অতিবাস্তব অন্বিত দৃশ্যটির বর্ণনা রঞ্জুর নিজের মুখে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কথনভঙ্গিতে লেখকের আবির্ভাবের পর দৃশ্যের দ্রুত রূপান্তর ঘটে। আলোছায়ায় রঞ্জু দেখতে পায়, নিশ্চিন্তপুরের (*পথের পাঁচালী*তে নিশ্চিদিপুর) 'সময়-কাদা' নির্লিপ্ত মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। এই পরিবেশ নির্মিতির মাধ্যমে লেখক নিম্নোদ্ধৃত স্মৃতিকল্পনার সঙ্গে একাত্ম হতে আমাদের বাধ্য করেন :

রঞ্জুর নিজের কথা, তার সম্পর্কে মা-বাবার কথা শুনে মনে হয়, সে যুবক বয়সের কেউ, রোগা এবং কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। তার ঘর বাইরে থেকে বন্ধ থাকে। সে যেকোনো সময় বেরিয়ে পড়তে পারে—এ আশঙ্কায়। রঞ্জু যখন দরজা খোলার জন্য মাকে ডাকছে, তখন মা-বাবার কথোপকথনের অংশ :

> 'ডাক্তার বললো না ওয়েদার পাল্টালে একটু ইমপ্রুভ করতে পারে...দরজা? খুলেই দাও।...যদি বেরিয়ে যায়?' (পৃ-১)

মা-বাবার ঘরে রঞ্জু কী ফেলে এসেছিল, গল্পে কোথাও তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। মায়ের ঘরে রঞ্জুর ফেলে আসা জিনিস খুঁজে পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। পায়ওনি সে। কারণ, সে তার অপরিণত জীবনের শৈশবের আনন্দের নির্ভরতা ও স্বপ্নের যে সময় ওই ঘরে মায়ের কাছে অতিবাহিত করেছিল, তা আর ফিরে পাওয়ার কথা নয়। তার এবং মা-বাবার ঘরের মাঝের ঘরে : 'অঞ্জু মঞ্জু দুটো বিছানায় অনায়াস ঘুমোচ্ছে, স্বপ্নময় নরম অন্ধকারে, সাধের মধ্যে সেঁধে।' (পৃ-৪)

যে সময় রঞ্জু ফেলে এসেছে, সে সময় এখন যাপন করছে তার দুই অনুজ বা অনুজা। ওপরে উদ্ধৃত বাক্যটি তারই ইঙ্গিত দেয়। এ কথা বোঝানোর জন্যই এই ঘুম-দৃশ্যের বর্ণনা, পরে এদের সম্পর্কে আর কোনো কথা নেই। অঞ্জু-মঞ্জুকে সাধের মধ্যে ঘুমোতে দেখেও রঞ্জু মা-বাবার ঘরে কী ফেলে এসেছে, তা মনে করতে পারে না। তাই মা-বাবার প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জুকে বলতে হয় : '—না বোধহয় অন্য কোনো সময়ে কি যেনো ফেলে গেলাম, আমি ঠিক—কি যেনো।' (পৃ-৪)

অবচেতন মনে মানুষের কিসের চাহিদা থাকে, থেকে থেকে কী সে খুঁজে বেড়ায়, নিজেই জানে না। কেবল সে খোঁজে এবং খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—মানুষের এ ধরনের একটি দার্শনিক জীবন অন্বেষণের ইঙ্গিত এ গল্পে প্রকাশ পায়।

রঞ্জুকে তার বাবা বিশাল মাঠে অগণিত ভেড়া কল্পনা করে গুনতে গুনতে টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলেন। তিনি বলেন : 'আমি কতোদিন এমন ঘুমিয়েছি।' কিন্তু রঞ্জুর জিজ্ঞাসা : 'আমি এক জন্ম-ক্লান্ত লোক, আমার তবে ঘুম আসে না কেন?' (পৃ-৫) ঘুম আসে না, কারণ, এক প্রজন্মের সঙ্গে পরের প্রজন্মের, এক সময়ের সঙ্গে পরবর্তী সময়ের দুস্তর ফারাক। একদিন যে বয়সে রঞ্জুর বাবা অনায়াসে যা করতে পারতেন, সে বয়সে রঞ্জুরা তা করতে পারে না। সময়ের সঙ্গে জীবনযাপনের ধরন ও জীবনবোধ বদলে গেছে এবং বহিরিস্থিত ও অন্তরিস্থিত জটিলতা ও অস্তিত্বের সংকট নানাভাবে দ্রুত বেড়ে গেছে।

বাস্তবতার মুখোমুখি। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পের এ পর্যায়ে 'কতোকাল হলো দুর্গা মারা গিয়েছে!'—এই তথ্য নির্দেশ করছে: রঞ্জুর শৈশব মা-বাবার ঘরে বা ঘরের বাইরে কোথাও নেই—হারিয়ে গেছে। তখন আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের যুগ, মানুষের আত্মবিকাশের স্তব্ধতার যুগ। এই সময়, বয়স ও পড়াশোনা রঞ্জুকে অনেক দূর নিয়ে এসেছে। নাগরিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সে অসুস্থ-অপ্রকৃতিস্থ—শৈশব খুঁজে ফেরাও অসুস্থতার লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফায়ার ব্রিগেডের লাল রঙের দ্রুতশ্বাস গাড়ি ছুটে যাওয়ার পর রঞ্জু বাইরে এসেছিল, 'এই বাদলা রাতে আগুন লেগেছে কোন্‌খানে?'—লেখকের এই নৈর্ব্যক্তিক জিজ্ঞাসা আসলে ব্যক্তিক, বাদলা রাতে আগুন লেগেছিল রঞ্জুর মধ্যেই। উত্তম পুরুষে লেখা সূচনাংশ স্মরণীয়: 'বৃষ্টি-বুনোট এই সব রাতে আমার ঘুম আসে না।'

শহর 'মনোটোনাস', সময় 'লোনলী-লগ্ন', বৃষ্টি 'একজন অচিন দীর্ঘশ্বাস'—এসব প্রসঙ্গ আমাদের জানায়, বাদলা রাতে রঞ্জুর ভেতরে আগুন লেগেছিল—শৈশব খুঁজে ফেরার মধ্য দিয়ে যে স্নেহ-ভালোবাসাময় একটা জীবন অন্বেষণ করছিল; পূতিগন্ধময় নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা, রুদ্ধশ্বাস রাজনৈতিক প্রতিবেশ, মানুষের মনোজটিলতা আর আত্মকেন্দ্রিকতায় যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পুলিশ কনস্টেবলের সঙ্গে রঞ্জুর দেখা হলে সে জানায়, রঞ্জুর বাবা একসময় রাজনীতি করতেন বৃহত্তর ভারতে। ঢাকা থেকে দিল্লি মিটিং করে বেড়াতেন। তখন রঞ্জু তার জন্মের আগের দিনগুলোর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে:

> এইসব দিন আমার জন্মের কতো আগে মিশে গিয়েছে। তাদের জন্যে আমার মন এমন করে কেন? আব্বার রক্তের সঙ্গে এই দিনগুলি কি আমার শরীরে উজান বেয়ে এলো? আমার ভারি ইচ্ছে করে একবার এদের ছুঁয়ে দেখি। (পৃ-৯)

রঞ্জু শুধু স্মৃতিকাতর নয়, অতীতকাতরও হয়ে পড়েছিল। তার এই অতীতপ্রীতি তার পশ্চাৎপদতার নির্দেশক নয়, কারণ সে অতীতের কেবল সেসব কথাই ভাবছিল, যেখানে প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন ছিল, রাজনীতি ও ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা ছিল। এখন মানুষের মধ্যে সেই সংঘবদ্ধতা নেই, তার বাবাও নেই আগের মতো। তার দুঃখ হয়েছিল এই ভেবে: 'দিন দিন আব্বা বড়ো সাধারণ ও সংসারী হয়ে পড়েছে।' (পৃ-৪)

রঞ্জু যখন তার হারানো জিনিস খুঁজে পাচ্ছিল না, তখনকার একটি পঙ্‌ক্তি: 'মৃত্যুমন্থর এই রাত্রি কেবলি সময়হীন ছড়িয়ে পড়ে।' এই রাতেই রঞ্জু শহর শেষ করে নদীর তীরে চলে আসে। নদীর জলকে তার মাঠ বলে মনে হয় এবং

ভাবনার মধ্যে সত্যিই সময়কে সে অতিক্রম করে যায়। সে ভাবে : 'এই মাঠে, এক হাজার নয়শো তেতাল্লিশ বছর আগে আমার স্কুলের বন্ধুরা এখানে ক্রিকেট খেলতো।' (পৃ-১০) কিন্তু তার খেলা হয়নি। সে প্রবলভাবে স্মৃতি রোমন্থন করে। মলিন নদীতে দুঃখী চাঁদের ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না, আঁধারে নিসর্গের মূর্তি, নদীর শীর্ণ সুবাস—এসব এমন এক পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করে, যা আলো এবং অন্ধকারের; বোঝা এবং না বোঝার। ফেলে আসা বস্তুর কথা ভাবতে ভাবতে নদীর জলে কান পেতে রঞ্জু শুয়ে পড়ে। আরেকবার স্মৃতি রোমন্থনের সময় প্রবল ঝড় শুরু হলে শিমুলগাছের মস্ত একটা ডাল ভেঙে পড়ে রঞ্জুর গায়ের ওপর।

সে কি মরতেই নদীর তীরে শিমুলগাছের তলায় এসেছিল? স্বেচ্ছায়?—সহজে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। কিন্তু এর উত্তর অনুসন্ধান অসম্ভব নয়। শুয়ে পড়ার পর বৃষ্টি আসে :

> ওর এখন একটু তেষ্টা পেয়েছে : জিভ দিয়ে ঠোঁট বুলোতে বুলোতে রঞ্জু শুনতে পায়, নদীর অনিকেত জলে পাগল ঢেউয়েরা জন্ম নিচ্ছে কেবলমাত্র মরবার জন্যে। (পৃ-১০)

উচ্ছল ঢেউয়ের অভ্যন্তরে মৃত্যুর এই বাসনাকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে রঞ্জুর আত্মহননের গূঢ় অভীপ্সা উপলব্ধি করা যায়। এই গল্পের প্রকৃতি বর্ণনা, আলো-আঁধারি পরিবেশ, সর্বোপরি রঞ্জুর মৃত্যু জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' (*মহাপৃথিবী*) কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'আট বছর আগের একদিন' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রচনার সময়ের ব্যবধান কম নয়, বক্তব্যেও ব্যবধান অনেক—মনে রেখেছি। তবু, কবিতাটার কথা মনে আছে, এই কয়টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করে :

> জানি—তবু জানি
> নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ—নয় সবখানি;
> অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়
> আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে :
> আমাদের ক্লান্ত করে
> ক্লান্ত-ক্লান্ত করে;
> লাশকাটা ঘরে
> সেই ক্লান্তি নাই
> তাই
> লাশকাটা ঘরে
> চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতার অধিক মানুষের যে বিস্ময়বোধ, তা বিপন্ন হলে সে অনুভূতি মানুষকে ক্রমাগত ক্লান্ত করে; অশ্বত্থের ডালে দড়ি বেঁধে তাতে ঝুলে পড়ার প্ররোচনা দেয়। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় ক্লান্তি নিয়ে মরতেই গিয়েছিল একজন মানুষ এবং মরেছেও। রঞ্জু মরতেই গিয়েছিল, সরাসরি এ কথা বলা যায় না। তবে, জীবনে তার জন্য কোনো আনন্দ অবশিষ্ট ছিল না, এবং সেই বৃষ্টির রাতে শহর ছেড়ে নদীর তীরে শিমুলগাছের তলায় অসুস্থ রোগা রঞ্জুর শুয়ে পড়ার অর্থ মৃত্যুকেই ডেকে আনা। কিন্তু কবিতার মানুষটির মতো পরিকল্পনা করে ঝুলে পড়ার মতো অবস্থা রঞ্জুর ছিল না। ভাববার অবকাশ আছে যে, রাজনীতি থেকে, ঐক্যবদ্ধতার সংগ্রাম থেকে বাবার মতো সংসারে ফিরে গিয়ে সাধারণ হয়ে ওঠা, স্নেহ-ভালোবাসাহীন যাপিতজীবনে যান্ত্রিক হয়ে ওঠা রঞ্জুর বিস্ময়বোধকে বিপন্ন করেছিল। সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার বিস্ময়-চিহ্নিত স্বপ্নময় শৈশব—ফলে সবাই, মা-বাবাসহ, তাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে করেছে। এই রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে রঞ্জুর জন্য একধরনের মুক্তি কাম্য হয়ে উঠেছিল। ফলে সে নদীর তীরে শুয়ে পড়েছিল, নদীর জলে কান পেতে অকাললুপ্ত 'জলের অন্তর্বাস থেকে উঠে আসা নিরেট ভারী গন্ধের' জন্য। শিমুলের ডাল ভেঙে রঞ্জুর গায়ে পড়ার পর :

> ভিজে শিমুল ফুলের রাশি স্তূপাকার পড়ে রয়েছে ওর চোখের ওপর...শুঁকবে বলে রঞ্জু জোরে নিঃশ্বাস নিতে চাইলো; কিন্তু ওর নিঃশ্বাস তখন শেষ হয়ে এসেছে, রঞ্জু সুবাস নিতে পারলো না। (পৃ-১১)

শিমুল ফুলের সুবাস নিতে চাওয়ার আকুলতার মধ্যেও রঞ্জুর জীবনপ্রীতিই মূর্ত হয়েছে—যে জীবন সে অন্বেষণ করেছিল, যে জীবনে সে উপনীত হয়েছিল, তাকে সে গ্রহণ করতে পারেনি। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের এ প্রবণতাটুকু উপলব্ধ হয় যে, মানুষ যখন ব্যথিত-আহত-অস্থির হয়, বেদনা ও বিবমিষায় আক্রান্ত হয়, তখনই তার ওপর মধুর-আনন্দের স্মৃতিগুলো ভর করে। রঞ্জুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিন্তু কোন ধরনের জীবন তার মধ্যে এ অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল, এ গল্পে তার ইঙ্গিত থাকলেও স্বরূপে সেগুলোর উন্মোচন নেই। তবে ইলিয়াসের প্রায় প্রতিটি গল্পে যে জীবন ও সমাজবাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেসব মোটেই সুখের বা আনন্দের নয়, সরল তো নয়ই। সেখানেও আমরা মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা, মনোবৈকল্য, সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক অধঃপতন, ক্ষমতাসীন পক্ষগুলোর নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীন আধিপত্য, আভিজাত্যের ফাঁকা আস্ফালন, এগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনচর্চা, মানুষের আদিম মনোবাস্তবতা, জীবনের প্রতি নিরাসক্তি প্রভৃতি

প্রত্যক্ষ করি। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় জীবনের এই রূঢ় রূপের বিস্তৃত বিবরণ নেই, কিন্তু সংকেত আছে। এখানে পরিপ্রেক্ষিত ও পরিবেশ বর্ণনায় যে আলো-অন্ধকারের কবিতাময় খেলা আছে, সেটা পরের গল্পগুলোতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ গল্পে লেখককে ঠিক নির্মোহ বলা যায় না। নিরাবেগ বর্ণনাভঙ্গিও অনুপস্থিত। পরের গল্পগুলোতে কবিতাময় কোনো পরিবেশ-প্রতিবেশের বর্ণনা নেই, আছে জীবনকে অবিকল রূপের ভেতরে উন্মোচনের মধ্য দিয়ে দৃঢ় অগ্রসরণ, নির্মোহ অথচ দীর্ঘ অভিযাত্রা। যে জীবন একজন মানুষকে অসুস্থ-অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে, সে জীবনে খননকার্য চালিয়েছেন ইলিয়াস; 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পটিকে সেই জীবনের চিত্রায়ণের ভূমিকা বলা যায়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় সমকালীন রূঢ় জীবনের ছবি না থাকলেও তার ইঙ্গিত আছে। বহুমাত্রিক ইঙ্গিত দেওয়া শিল্পের একটা বড় কাজ, সন্দেহ নেই, কিন্তু কথাসাহিত্যের জন্য তার চেয়েও বড় কাজ বাস্তব জীবনযাত্রাকে কথনভঙ্গির সঙ্গে অন্বিত করে তোলা। সংগত কারণেই ইলিয়াস কেবল ইঙ্গিতে তৃপ্ত থাকতে পারেননি, পারেননি বলেই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' সুখপাঠ্য হওয়া সত্ত্বেও আর ও পথ মাড়াননি তিনি। সমকালে মানুষের যাপিতজীবনকে নগ্নরূপে তুলে আনাই অতঃপর তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

বর্তমান তিক্ত এবং সাধারণ বর্ণহীন। মানুষ খানিকটা ভবিষ্যতে বাঁচে, এই দুই ধরনের বাঁচাই এক ধরনের স্বপ্নের মধ্যে বাঁচা, অনেকটা আত্মরক্ষার মতো। বর্তমান থেকে মুখ ফেরালেই তবে অতীত বা ভবিষ্যতের মধ্যে গা ঢাকা দেওয়া চলে। কিন্তু যে জীবন প্রতি মুহূর্তে কাটাতে হচ্ছে, তার পরিধি ও প্রাবল্য আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে গ্রাস করে না কি?[১]

আসলেই, মানুষের যাবতীয় অস্তিত্বের সংকট নিরন্তর বর্তমানে, মহৎ শিল্পীর পক্ষে এই বর্তমানকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না, গা ঢাকা দেওয়া চলে না। এ জন্য ইলিয়াস 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র ঢঙে লেখা গল্প থেকে বেরিয়ে তিক্ত ও বর্ণহীন বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। একইসঙ্গে মানুষ যে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাঁচে, বর্তমানকে গৌণ না করে, তাকেও স্পষ্টতর করে তুলেছেন কোনো কোনো গল্পে।

অন্য ঘরে অন্য স্বর-এর দ্বিতীয় গল্প 'উৎসব'-এ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভিন্ন ধরনের দুটি উৎসবের বর্ণনার মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের শেষ দিকে বিকাশমান ঢাকা নগরের মানুষের জীবনযাপন, তাদের পরিপার্শ্বসহ তুলে ধরেছেন। এই গল্পে একইসঙ্গে ধানমন্ডির বর্ণাঢ্য এবং পুরনো ঢাকার পূতিগন্ধময় জীবনচিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। ইলিয়াস নিজে বেড়ে উঠেছেন পুরান

ঢাকায়, এ অঞ্চলের জীবনচিত্র তাঁর গল্পে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু বিকাশমান তথাকথিত অভিজাতদের ওপরও রয়েছে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। গল্পের মূল চরিত্র আনোয়ার আলিকে আর্থিকভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত বলা যায়। জীবনের কোনো স্বপ্নই বাস্তবায়িত না হওয়ায় পুরান ঢাকার দুর্বিষহ প্রতিবেশে বসবাসকারী আনোয়ার আলির মধ্যে ঢুকে পড়ে বিকৃতি। ধানমন্ডিতে পুরনো বন্ধুর বৌভাত খেতে গিয়ে অতৃপ্ত আনোয়ারের দ্রষ্টব্যের বিষয় হয়ে ওঠে 'ভালো ভালো মেয়ে'; তাদের সঙ্গে আলাপ এবং সমস্ত বিয়ে বাড়ির কুলীন কলরব অন্তত সপ্তাহ খানেক শরীরে সুখের উদ্রেক করবে বলে ভেবেছিল সে। কিন্তু নিজের সরু গলিতে ফিরে এসে মানুষ ও কুকুরের অপকর্মকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোতে দেখে সে যুগপৎ বিরক্ত ও দুঃখিত হয়ে পড়ে। ঘরে এসে স্ত্রীর শরীরে সে কোনো শিহরণ পায় না; উৎসবের সুসজ্জিত নারীদের শরীর তাকে ঘিরে রাখে। নাইট শো দেখে ফেরে কুলি-মজুর, রেস্টুরেন্টে হিন্দি ছবির গান চলে। এ সময় একজোড়া কুকুরের রতিকর্ম শুরু হলে মধ্যরাতে এই সরু গলিতে আরেক রকমের উৎসব শুরু হয়। দুই উৎসবের তুলনা করতে করতে এবং কুকুরের রতিকর্ম দেখতে দেখতে সে কামবোধ ফিরে পায়।

দেশের মানুষের ওপর শোষণ চলে, জাতীয় আয়ের টাকায় বাড়ে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার চাকচিক্য; ঢাকা সম্প্রসারিত হয়। পুরান ঢাকায় মানুষ আর কুকুর একাকার হয়ে পড়ে থাকে। নগরের দুই অংশের জীবনপ্রণালি, যা মেরুদূরত্বে অবস্থান করে—আমরা প্রত্যক্ষ করি বিএ পাস একজন অতৃপ্ত কেরানির চোখ দিয়ে। কলেজজীবনে যখন সে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, তখন আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের যুগ চলছে। সে আবেগ, সে স্লোগানের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। স্বাভাবিকভাবেই জীবনকে দেখার সে সুস্থতাও অন্তর্হিত; টাকা সেখানে জীবনের প্রধান নিয়ন্তা। তাই স্ত্রীর সঙ্গে আনোয়ারের সম্পর্ক ভালো থাকা না থাকা নির্ভর করে পকেটে টাকা আছে কি নেই, তার ওপর। কিন্তু মাসের শুরুতে পকেটে টাকা থাকা সত্ত্বেও উৎসবের উজ্জ্বলতার বিভ্রান্তির ফলে বউকে মনে হয় নিথর, অসহ্য। স্ত্রী সম্পর্কে তার ক্ষোভ, 'যতই সেক্সি হোক না, কায়দাটা এরা ঠিক রপ্ত করতে পারে না।' (পৃ-১৯)

আনস্মার্ট, জবুথবু শুয়ে থাকা শাড়ির ভেতরে বুক নেই, পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে বেঢপ এক কোলবালিশ—এই স্ত্রী সালেহাকে দেখে তার বিরক্তি বাড়ে। স্ত্রীকে স্পর্শ করে মনে হয়, হাতে গ্লাভস পরে আছে। এক বন্ধুর বউয়ের কথা মনে পড়ে। ছোটবেলার বন্ধু হয়েও বন্ধুর বাসায় যায়নি আনোয়ার, বন্ধুর বউয়ের এই অনুযোগের উত্তরে বলার জন্য সে একটি বাক্য

সাজিয়েছিল, কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্তসুলভ হীনম্মন্যতার কারণে নিজের ভাবনাকে সে কখনো জুতসই করে প্রকাশ করতে পারে না। তাই 'কতোকালের বন্ধুত্ব কিন্তু দ্যাখাওতো হয় না কতোকাল। যাবো একদিন অবশ্যই যাবো, আপনাদের বিরক্ত করে আসবো' (পৃ-২০)—মনে মনে সাজানো এই নিরীহ বাক্যটি সে বলতে পারে না।

ধানমন্ডির উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের বর্ণাঢ্য জীবনের অন্তরালে রয়েছে অন্তঃসারশূন্যতা। এখানে অংশগ্রহণকারীরা যা বলে, তা বিশ্বাস করে না। সামনে যে একজনের প্রশংসা করে, পেছনে তার কণ্ঠ থেকেই ঝরে পড়ে ঈর্ষা। একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে এসবের অনেকটা বোঝা যাবে :

> সম্মানজনক দূরত্ব নিয়ে পকেটে-হাত দাঁড়িয়ে আছেন মণিমুক্তাখচিত বড় বড় সব প্রাসাদ। বোঝা যায় ঐসব গ্রহ-নক্ষত্রের কোয়ার্টার ডজন হাফ ডজন রূপসী অন্য কোনো ভাষায় বাক্যালাপ করে। এই সেতারে মালকোষ ধরলো কি হাই তুলতে তুলতে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে মন্থর আঙুলে। মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আজহার এলে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল.পি. চালিয়ে দিয়ে স্যোসালিজম সম্পর্কে গল্প করছে কি নরোম গলায়। আবার এরই ফাঁকে সময় করে লোনলিনেসে কি মিষ্টি কষ্ট পায়। (পৃ-১৩)

এর পাশাপাশি আনোয়ার আলি যেখানে থাকে, সেই সরু গলির মধ্যরাতের জীবনচিত্র :

> বড়ো রাস্তার উঁচু রোয়াকে জুয়াড়িদের আড্ডা থেকে কে ১টি গানের কলি ভাঁজছে, ১টি জনপ্রিয় গানের প্যারোডি, 'এই কার্তিক মাসে দুই কুকুর এসে'—কিন্তু ওই আড্ডা থেকেই আরেকটি উচ্চকণ্ঠ ধ্বনি ওঠে, 'আব্বে হালায় এক খামচা নিমক লইয়া আয়না বে, নিমক দিলেই তো ছুইটা যায় গিয়া; যানা পিচ্চি, লইয়া আয়না হালায়, কইতাছি নিমক দিয়া ফালা।' ফলে গানের বাকি অংশ আর শোনা যায় না। কিন্তু কে যাবে তার লবণ আনতে? কেউই অবস্থান পরিবর্তন করতে চায় না। (পৃ-২২)

—এই পরিবেশে, উচ্চবিত্ত-উৎসবের স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসা, ছা-পোষা কেরানি আনোয়ার আলিকে এদের স্তরেই নেমে আসতে হয়। বিএ পাস লেবেলটি কোনো কাজই দেয় না। কুলি-মজুর-গ্লাসবয়-রংবাজ-ক্যানভাসার—সবার সঙ্গে আনোয়ার যেমন কুকুরের রতিদৃশ্য উপভোগ করে, তেমনি পাশের বাসার নসরুল্লা সর্দার এ দৃশ্যের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের আক্ষেপ ঝাড়লেও নিজে চোখ ফেরাতে পারেন না। নসরুল্লার বাবা একসময় মহল্লার প্রধান ছিলেন, নবাব সলিমুল্লাহ তাঁর বাবাকে সর্দারজির তাজ উপহার

দিয়েছিলেন—এ গল্প সে অন্যের কাছে উপস্থাপন করে বর্তমান অভাবেও অতীতে মুখ গুঁজে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলতে চায়। অতীত ঘেঁটে মুখে আভিজাত্যের প্রলেপ মেখে এ দৃশ্য সম্পর্কে যদিও সে বলে, 'মহল্লার মইদ্যে কতো শরীফ আদমী আছে, ঘরে বিবি বাল-বাচ্চা আছে, আর দ্যাখছেন খানকির পুতেরা কি মজাক করতাছে রাইত একটার সময়?' (পৃ-২৩) কিন্তু তার কথা বা আচরণের মধ্যে 'শরীফ আদমী'র কোনো আভাস পাওয়া যায় না।

এই পরিস্থিতিতে বিবমিষায় আক্রান্ত আনোয়ার আলিকে নিয়ে ইলিয়াস চলে যান প্রকৃতি বর্ণনায়। চাঁদের ফর্সা হাওয়াকে আনোয়ার আলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে এবং কুকুরকে একাকার করে দেন, চাঁদ হয়ে ওঠে ধানমন্ডির উৎসবের প্রতীক। জ্যোৎস্নায় ফর্সা হাওয়া আনোয়ারের করোটির ভেতরে সুরসুরি দিলে তার হাসি পায় আর :

> ১ জন আবেগপ্রবণ কুকুর উৎসব থেকে একটু দূরে রাস্তার মোড়ে রাখা ঠেলাগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গোলগাল মিষ্টি মিষ্টি চাঁদের দিকে বিষণ্ন চোখ তুলে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে খুব করুণ সুরে কাঁদে। (পৃ-২৪-২৫)

যেন আনোয়ার আলি নিজেই ঠেলাগাড়ির মতো জীবনকে ঠেলতে ঠেলতে, সে যা পায়নি, ধানমন্ডিতে বৌভাতে দেখা মিষ্টি চাঁদের মতো নারীদের দিকে বিষণ্ন চোখ তুলে, জীবনের যাবতীয় অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার জন্য করুণ সুরে কাঁদছে।

কুকুরের রতিদৃশ্য উপভোগের পর সে নিজের শরীরের শিহরণ পুনরায় ফিরে পায়। স্ত্রীর পাশে শুয়ে এবার মনে হয় হাত থেকে রাবারের গ্লাভস খুলে গেছে। কলেজজীবনের তারুণ্যের স্বপ্নের ভাঙন, রাজনৈতিক অবক্ষয়, একদিনকার সমাজতন্ত্রীদের ধানমন্ডিতে সুদৃশ্য প্রাসাদের মালিক হওয়া, বিদেশি দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি হওয়া, নিজের অভাবগ্রস্ত সংসার, দুর্বিষহ প্রতিবেশ, স্ত্রী সালেহার আনস্মার্টনেস—সব মিলিয়ে যে বিবমিষা-ক্ষোভ-অস্বাভাবিকতা জেগে ওঠে আনোয়ার আলির মধ্যে, সে অস্বাভাবিক অবস্থায় মধ্যরাতে কুকুরের রতিক্রিয়া দেখে নিজের মধ্যে কামোত্তেজনা ফিরিয়ে আনা ছাড়া উপায় থাকে না তার। এভাবে কুকুর, বস্তিবাসী, বিএ পাস স্বপ্নাহত আনোয়ার একাকার হয়ে ওঠে 'উৎসব' গল্পে। লক্ষ করা যায়, সমাজ, তার উপাদান-উপকরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—সবকিছুকেই লেখক সূক্ষ্মভাবে দেখেন। আনোয়ারের যে বিকৃত মনোকল্পনা, তা তার সন্নিহিত প্রতিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। জীবনের ওই বিপ্রতীপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষকে শুধু অসুখী ও অভাবগ্রস্তই করে না, একইসঙ্গে অসুস্থ ও বিকারগ্রস্তও করে তোলে। 'উৎসব' গল্পটি আধা বুর্জোয়া ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা ঢাকা নগরের এক প্রান্তের

সমৃদ্ধি, অন্যপ্রান্তের পচন এবং এ দুয়ের দর্শক ও শেষোক্তটির ভোক্তার মনোবিকারের বিশ্লেষণ দিতে দিতে নগরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও আস্ফালনকেও তীব্র ব্যঙ্গ করা যায়।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ও 'উৎসব' গল্পদ্বয়ের পটভূমি ষাটের দশক। 'প্রতিশোধ'-এ ইলিয়াস পা রেখেছেন সত্তরের দশকে। এই গ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'যোগাযোগ'-এর জন্য রাজনৈতিক সময়কালের বিচার আবশ্যক না হলেও 'প্রতিশোধ', 'ফেরারী' ও নামগল্প 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমির আলোচনা দাবি করে। গল্প তিনটি রচিত হয় ১৯৭১-৭৫ সময়কালের মধ্যে। এগুলোর পটভূমিও এই সময়কেই ঘিরে।

এই সময়ে সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের মনে আশা ভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। দেশের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে অরাজকতা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেনি—এ উপলব্ধি অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল হতে থাকে। ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক শক্তির অপব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্নমতাবলম্বী এবং সাধারণ মানুষ লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হতে থাকে। এর চিত্র 'ফেরারী' (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*) 'খোঁয়ারি' (*খোঁয়ারি*) 'মিলির হাতে স্টেনগান', 'দখল' (*দুধভাতে উৎপাত*) গল্পে লক্ষ করা যাবে। 'প্রতিশোধ' গল্পে এই রাজনীতি-লালিত সুবিধাবাদীদের আনাগোনা আনিসের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হতে শুরু করে।

এ গল্পে মূলত মধ্যবিত্ত যুবক ওসমানের মানসিকতা, আস্ফালন, তার নানা পরিকল্পনা ও ব্যর্থতাকে তুলে ধরাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাতেও ইলিয়াস সমকাল-বর্তমান-প্রতিবেশ থেকে বিচ্যুত হননি; ওসমানের প্রতিশোধস্পৃহা ও ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রতিবেশ-রাজনীতিও জায়গা করে নিয়েছে। গল্পের সমকাল মুক্তিযুদ্ধোত্তর এবং স্থান ঢাকা হলেও লেখক একবার কলকাতা-আশুগঞ্জ ঘুরে আসেন। বাবার অসুখের খবর পেয়ে আশুগঞ্জের একটা প্রজেক্টের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ওসমান ঢাকায় আসে। এসেই সে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বোনের স্বামী বাম রাজনৈতিক কর্মী ও বামপন্থী একটি দৈনিকের সাংবাদিক আবুল হাশেমকে হত্যার পরিকল্পনা করে। সবার ধারণা, রোকেয়ার বন্ধু নার্গিসকে বিয়ে করবার উদ্দেশ্যে হাশেম একদিন পালিয়ে বিয়ে করা বউ ওসমানের বোনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। সে নিজে গাড়িতে থাকা সত্ত্বেও তার কিছুই হয়নি, এ অভিযোগে ওসমানের বাবা অসুস্থ আবদুল গনিও হাশেমকে তার দেওয়া বাড়ি ছেড়ে দিতে বলে। আনিসও হাশেমকে খুন করতে চায় এবং ওসমানকে সে

কাউয়ার্ড বলে গালি দেয় এ কারণে যে, ওসমানের সঙ্গে নার্গিসের বিয়ে হবে, সবাই এটা জানত, অথচ হাশেম নিজের বউকে মেরে নার্গিসকে বিয়ে করার পরও ওসমান কিছুই করতে পারেনি।

আসলে ওসমান কিছুই করতে পারে না। সে একটি স্বপ্ন দেখে এবং হাশেমকে খুন করবার পরিকল্পনা করে—কোনোটিই তার বীরত্বের প্রমাণ দেয় না; বরং তার ভীরুতা, সংশয়, কাপুরুষতা ও অসহায়ত্বকেই তুলে ধরে। স্বপ্নে সে মই নিয়ে প্রজেক্টের একটি ক্রেনে উঠতে থাকে প্রায়ই এবং চূড়া স্পর্শ করার আগেই প্রতিবার তার পতন ঘটে। স্বপ্নে সে দেখে মেঘনার পাতালমুখী জলে গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য; লেখক একটিমাত্র বাক্যে যুগপৎ স্বপ্নে ও বাস্তবে ওসমানের ব্যর্থতা ও অসহায়ত্বের কথা জানিয়ে দেন, 'স্বপ্নেও না, বাস্তবেও না, ওসমান কোনোখানে সাঁতার কাটতে জানে না।' (পৃ-২৯)।

গল্পের সিংহ-অংশেই আমরা দেখি, ওসমানের মনোবিকার, স্বপ্ন-পরিকল্পনা ও তার দিক থেকে দেখা কিছু দৃশ্য। খুনের তিন ধরনের পরিকল্পনা তার মাথায় থাকলেও বিষয়টি সে কাউকেই জানায় না, এতে কাউকেই রাখে না, এমনকি যে আনিস নিজে হাশেমকে খুনের সংকল্প ঘোষণা করেছিল—তাকেও না। এ স্পৃহায় সে নিঃসঙ্গ। ছোট ভাই হলেও হাশেমের সঙ্গে আনিসের সম্পর্ক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণেই ভালো। 'মুক্তিযোদ্ধা' নামে পরিচিত এবং নানা সুবিধা আদায়কারী আনিস হাশেমের সঙ্গে 'কটা মাস প্রতিবাদ সভা ও শোকসভায় যোগদান করে, এখানে ওখানে লাঞ্চ-ডিনার মেরে ও লাঞ্ছিতা মাতৃভূমির জন্য নিবেদিত অশ্রুর সঙ্গে পাঞ্চ করা হুইস্কি-জিনের স্বাদে আপ্লুত হয়ে দেশে ফিরলো বিজয়ীর বেশে।' (পৃ-৩৭) আনিস নামের এই তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংগত কারণেই ভাই হওয়া সত্ত্বেও ওসমান বোন হত্যার প্রতিশোধের ব্যাপারে আনিসের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। আর কাউকে বিশ্বাস করাও সংশয়-স্বপ্নকাতর ওসমানের পক্ষে সম্ভব নয়। এসব মানুষ নিজের ইচ্ছা, ক্ষোভ, ভালোবাসার কথা কাউকে জানাতেও পারে না।

'উৎসব' গল্পে দেখেছি, বন্ধুর স্ত্রীকে বলার জন্য সাজানো একটি নিরীহ বাক্য আনোয়ার শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারেনি। স্টাডি ট্যুরে পাকিস্তানে গিয়ে ওসমান নার্গিসকে একমাত্র চিঠিটি লিখেছিল, তাতে নিজের কোনো কথাই সে লিখতে পারেনি, সে চিঠি পূর্ণ হয়েছিল পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের নিসর্গচিত্রের বর্ণনায়। আবুল হাশেমকে খুন করা দূরে থাক, তাকে বলার জন্য একটা ঝাঁজালো বাক্য গুছিয়েও উচ্চারণ করতে পারেনি, 'তুমি আমার বোনের মার্ডারার। ঐ

নার্গিসকে বিয়ে করবার লোভে আমার বোনকে খুন করেছো।' (পৃ-৩৩)

আনোয়ার-ওসমানের মধ্যে ক্ষোভ আছে, জ্বালা আছে; সাহস, শান্তি, স্বস্তি ও সুখ নেই। তাদের কেবল ঘরের আঙিনায় ঘোরাফেরা করতে হয়, বাঁচতে হয় স্বপ্ন, স্মৃতি আর ব্যর্থ পরিকল্পনার সমাহার নিয়ে।

ফলে ছাদ থেকে আবুল হাশেমকে নিচে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না, কল্পনায় হাশেমের পতনমুখী শরীর দেখে ভয়ে ওসমানের নিজেরই পা চোরাবালির মধ্যে আটকে যায়। ট্রাকের নিচে হাশেমকে ফেলে দেওয়ার চিন্তা করতে করতে তার যে ভাবনা, তাতে হাশেমের চরিত্রও মূর্ত হয় :

> শালার একটু ইন্টেলেকচুয়াল, একটু পোলিটিক্যাল, একটু কালচার্ড ও একটু কমার্শিয়াল মুণ্ডু ট্রাকের চাকায় চমৎকার ডিসেকটেড হয়ে যাবে। (পৃ-৪০)

মস্কো-কলকাতা ছাড়া যে কথা বলে না, সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্রের চর্চা ও ব্যবসা করে যে এখন মস্ত বড়লোক, তাকে ট্রাকের নিচে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ওসমান একটা রিকশায় উঠে পড়ে। 'ভাবনা চিন্তা করে ও দেখলো যে সাবধান হওয়াই ভালো। কারণ কার মধ্যে কখন কি লোভ জেগে উঠবে কে বলতে পারে।' (পৃষ্ঠা-৪৩) কোন লোকের কথা এখানে বলা বলা হচ্ছে, সে বিষয়ে লেখক স্পষ্ট কিছু না বললেও বুঝতে বাকি থাকে না যে, ওসমানের নিজেরই লোভ জেগে উঠতে পারে ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ার। তৃতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেটি আরও স্পষ্ট হয়। একটা লোহার রড হাতে ছাদে গিয়ে সে আবিষ্কার করে পাখার ঘুরন্ত ব্লেড—'পাখার ঘুরন্ত ব্লেডের কল্যাণে রক্তাক্ত হলো চারদিকের দেয়াল, গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলো ওসমানের লাশ।' এভাবে অবশেষে ওসমানের মনোবিকার ও আত্মহননের সুপ্ত ইচ্ছাই মূর্ত হয়ে ওঠে। নিজের লাশ দেখে তার বুকের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যায়। 'উপরে ছাদ নেই, কোনো ছাদ নেই, কেবলি আকাশ।' (পৃ-৪৫) এই একটি বাক্যে ওসমানের নিঃসঙ্গতা ও দিশাহীনতা প্রকট হয়ে ওঠে। তার জীবনে হৃদয়-প্রেম-বুদ্ধি-সঙ্গী-আয়ু—সব একাকার হয়ে আছে।

'উৎসব' গল্পে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের মেকি জীবন, সামনে প্রশংসা ও পেছনে নিন্দা আর ঈর্ষার ঝড় দেখেছি। আনিস সেই জীবনের দিকেই এগিয়ে যায়। দুপুরে সে হাশেমকে বোনের হত্যাকারী বলে শনাক্ত করে খুন করার সংকল্প ঘোষণা করে, রাতে একটি টেন্ডার ধরার ব্যাপারে সেই খুনির শরণাপন্ন হওয়ার জন্য পিতার সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছায়, হয়ে ওঠে হাশেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওসমানকে 'কাউয়ার্ড' বলার শক্তি সে পায় নার্গিসকে পাওয়ার ক্ষেত্রে ওসমানের ব্যর্থতা থেকে নয়, বরং যুদ্ধোত্তর কালে 'মুক্তিযোদ্ধা' নাম ভাঙিয়ে

অবৈধ পন্থায় নানাভাবে অর্জিত টাকার ক্ষমতা থেকে। হিন্দু দোকানদার ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার পর 'মুক্তিযোদ্ধারা' সেই দোকান চালায়। আবার তিনটা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৈরি করে সংঘাত। মানুষের দোকান দখল করে আনিসের বন্ধুবান্ধব। ঘর ভরে ওঠে বিদেশি জিনিসপত্রে। ওসমানের জীবনে এভাবে প্রাপ্তি-যোগ ঘটেনি বলেই মূলত সে কাউয়ার্ড। এই কাপুরুষতা ঘুচাতে গিয়ে তার অসহায়ত্ব আরও নগ্ন হয়ে উঠেছে।

পরিবেশ ও কাল ওসমান-আনোয়ারদের ধীরে ধীরে অসুস্থ করে দেয়। তাদের সবকিছু জায়গা করে নেয় করোটির ভেতরে। 'উৎসব'-এর কুকুরের রতিক্রিয়া দেখতে দেখতে চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে ফর্সা হাওয়া বয়ে এসে আনোয়ার আলির করোটির ভেতর সুরসুরি দিয়েছিল; আর 'আব্দুল গনির শ্লেষ্মাঘন কণ্ঠ থেকে অর্থহীন ধ্বনি বেরিয়ে এসে ওসমানের করোটিতে অকারণে তোলপাড় তোলে।' (পৃ-৩৮) করোটির ভেতরে তাদের যাবতীয় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত হয়। প্রবল অব্যবস্থার শিকার তারা, কিন্তু তাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে তাদের চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অস্বাভাবিকতা। সমকাল-প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এসব মনোকল্পনাবিলাসী চরিত্রের অভ্যন্তর দিয়ে ব্যক্তির অসহায়ত্বের এমন রুক্ষ-রূপ বাংলা গল্পে বিরল।

বস্তু-পৃথিবীর ছোট-বড় ঘটনা ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্জগতে কীভাবে, কতটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, বহির্জগতের ঘটনা-সংকেত মনোজগতে ভিন্ন ধরনের যে বাস্তবতার জন্ম দেয়, তার এক নবতর শিল্পরূপায়ণ ঘটিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'যোগাযোগ' গল্পে। সমাজের নানা টানাপড়েন ও রাজনীতি-কবলিত মানুষের দুঃসহ জীবনযাপনের বাইরের চিত্র ইলিয়াসের গল্পে এই প্রথম পাওয়া গেল (গ্রন্থিত গল্পগুলোর মধ্যে)। সন্তানের কাছ থেকে দূরে এসে সন্তানের জন্য মায়ের যে ভাবনা-বেদনা, তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা আছে এ গল্পে।

মামার অসুস্থতার খবর পেয়ে ঢাকার রোকনপুরে স্বামী ও ৭ বছরের সন্তানকে রেখে স্বরূপখালীতে আসে রোকেয়া। মামার বাড়িতে সজনেতলায় সে মৃত মাকে দেখে; ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে পুত্রের আহত হওয়ার সংবাদ শোনার পর তার মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং অবাস্তব দৃশ্য দেখার পালা বেড়ে চলে। তবে মনের অবস্থা সে কাউকে না জানালেও আচরণ ও মনোবিশ্লেষণে তার অবস্থা উপলব্ধ হয়। নিদ্রাহীন রোকেয়া ঢাকায় হাসপাতালে যাওয়ার পর সন্তান তাকে চিনতে পারে না। ব্যথায়-কষ্টে সে গোঙাতে থাকে ক্রমাগত—এভাবে রবীন্দ্রনাথের সেই 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ' অবস্থায়

গল্পের সমাপ্তি ঘটে। রোকেয়ার মধ্য দিয়ে যেসব অবাস্তব ও কাল্পনিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, বাহ্যত সেসব অবাস্তব সন্দেহ নেই, কিন্তু রোকেয়ার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করলে এসব দৃশ্যের অন্তরালের যুক্তিগুলো খুঁজে নেওয়া যায়। মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে সংঘটিত এসব ঘটনাকে তার অন্তর্গত বাস্তবতা বলা যায়।

মামাবাড়িতে সাদা শাড়ি পরিহিত, ৩ বছর আগে[২] মৃত মাকে দেখার আগে, এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে যে, বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি সজনেগাছ লাগিয়েছিলেন তিনি, মনের মধ্যে সন্তানের ভাবনা নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ির পেছনে পাতকুয়ো, বেগুন খেত, বাঁশঝাড় পেরিয়ে এসে রোকেয়া যখন পুকুরপাড়ে মায়ের লাগানো মস্ত সজনেগাছটা দেখে, তখন :

> সজনে তলায় সাদা কালো মাটিতে লম্বা লম্বা আঙুলের মতো সজনের ছায়া অল্প বাতাসে একবার ছড়িয়ে পড়ে, একবার গুটিয়ে নেয়। (পৃ-৫২)

অচেনা জন্তুর মতো ছায়া, চাঁদের ময়লা আলোর রহস্যময়তা, ভয়—সব একত্রে মায়ের লাগানো সজনেতলায় সাদা শাড়ি পরিহিত মেয়ের অবয়ব দেয়। একবার দৃশ্যমান, একবার অদৃশ্য অবয়বটি 'রোকেয়া, তোর পোলায় কেমুন আছে?' বলার পর রোকেয়া তাকে নিজের মা বলে শনাক্ত করতে পারে। কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে চারদিকে তাকানোর পর মূর্তিটি কোথাও দেখা যায় না। লেখক কৌশলে এই আপাত অপ্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বাস্তবের মধ্যে নিয়ে এসে বুঝিয়ে দিলেন, বাহ্যত এ ঘটনা সত্য নয়। সন্তানের জন্য ব্যাকুল রোকেয়াকে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে তার মৃত মা যখন নিজের সন্তানের কথাই জিজ্ঞেস করে, তখন বুঝতে পারি, এ জিজ্ঞাসা সন্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ রোকেয়ার নিজের ভেতর থেকেই উঠে এসেছে।

এত দূর এসে খোকনের কথা ভাবতে বড় সুখ—রোকেয়ার এ কথা মনে হলেও, যেহেতু মানুষের মনে ভালো লাগার রং ও মাত্রা অনেক রকম, সে কারণে, যে একসময় ভেবেছে দূরে এসে সুখ, সে-ই অন্য সময়ে সে সুখ খুঁজে পায় না; চোখের সামনে না থাকার ফলে ছেলের অমঙ্গল চিন্তায় সে কাতর হয়ে পড়লে একধরনের অপ্রকৃতিস্থতায় থেকে তার পক্ষে অবাস্তব দৃশ্য দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে। ছেলের দুর্ঘটনার খবর শোনার পর মামার বাড়িতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রোকেয়ার মনে হয়, সে ট্রেনে চেপেছে, রেললাইনের পাশের টেলিগ্রাফের গা ঘেঁষে সে মৃত মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং জীবিত স্বামীকে উবু হয়ে মাটি খুঁড়তে দেখে। শুনতে পায় মায়ের কণ্ঠস্বর : 'চাইরটা ঘণ্টা আগে আইলেও পোলাডার মুখে পানি দিবার পারতি।' (পৃ-৫৪) স্বামী বলছে :

খালি আম্মা আম্মা করছে, রাইত ভইরা স্যায় কেবল তোমারে ডাকছে। আমাগো সোনার টুকরারে মাটি চাপা দিয়া অহন আমি কেমনে বাড়ি যাই। (পৃ-৫৪)

খোকন মরে গেছে—মা এবং স্বামীর মধ্য দিয়ে এ তথ্য জানানো গুরুতর অবাস্তব মনে হতে পারত; সন্তানের চিন্তায় কাতর, সজনেতলায় মৃত মায়ের দর্শনে বিকারগ্রস্ত, খোকনের আহত হওয়ার খবরে দিশেহারা রোকেয়ার এ আশঙ্কা হতেই পারে যে, তার খোকা বেঁচে আছে তো! তার ভেতরে তার মা সব সময় ছিল। গল্প শুরু হয়েছে তার মায়ের কণ্ঠস্বর দিয়ে। ছেলে কাঁদছে বলে মা তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। জেগে সে দেখে, মূলত পাশের মহিলার কোলে এক শিশু কাঁদছে। ছেলের দুর্ঘটনার পর এই মৃত মা তার নিজেরই ভেতরে অপর এক সত্তা হিসেবে জেগে ওঠে। সেই সত্তার ভেতর দিয়ে সে দুর্ঘটনার পর এর নঞর্থক প্রতিক্রিয়াগুলো তুলে ধরেছিল; অপর সত্তা 'পোলার কাছে গিয়া খাড়াইতে পারলেই হ্যার ব্যাবাকটি বিষ মুইছা ফালাইতে পারতাম'—এই বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে সত্য, কিন্তু ক্রমশ নঞর্থক দিকগুলো অস্বীকার করার শক্তি হারিয়ে সেটি দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তার খোকন যেমন মায়ের কাছে আশ্রয় চাইবে, তেমনি, আশা-আশঙ্কা, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের দোলায় দিশেহারা রোকেয়ারও একটা আশ্রয় দরকার হয়ে পড়েছিল। এ জন্যই সে তার মাকে অবচেতনে নিজের মধ্যে উপস্থিত করেছে।

সন্তানের দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর রোকেয়াকে কোনো রকম হাহাকার করতে দেখা যায় না। আঁচল দিয়ে একবার চোখ মোছার দৃশ্য বাদ দিলে বাইরে থেকে তার অন্য কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। এমনকি ঢাকায় রোকনপুর পৌঁছে স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর খোকন কেমন আছে, তা-ও জানতে চায় না। হাসপাতালে দু-একটা সংলাপ ও খোকনের কপালে হাত বোলানো ছাড়া সাধারণভাবে এ ধরনের ঘটনায় একজন মায়ের যে রকম প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার মধ্যে সে প্রতিক্রিয়াও অনুপস্থিত। এ সমস্তই আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ঠেকে; কিন্তু লেখকের কৌশলটি বুঝতে পরলে রোকেয়ার মনোজগতে প্রবেশ করা সম্ভব হয় এবং বাহ্যিক অস্বাভাবিকতার যৌক্তিক কারণও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে সে এত বেশি ভাবনাকাতর এবং তার মনোজগৎ এতটা ঘটনাকাতর হয়ে ওঠে যে, তা তাকে বাহ্যিক প্রকাশের ক্ষমতারহিত করে দেয়। স্বল্পপখালীতে থাকাকালেই সন্তানের মৃত্যু-কল্পনা তাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। সে থাকলে খোকনের এমন দুরবস্থা হতে পারত না—এ রকম একটি সিদ্ধান্ত তাকে চূড়ান্তভাবে আসামির

কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। খবর পাওয়ার পর একরাত সে নির্ঘুম, তারপর দীর্ঘ ট্রেনযাত্রা, ফলে তার 'চোখের কোণে জলের দাগ শুকিয়ে এক টুকরো মেঘের মতো দ্যাখায়'—এই মেঘ তার মনের ওপরই শুষ্ক পাথর হয়ে চেপে বসে।

স্বরূপখালীতে সন্তানের চিন্তায় যখন রোকেয়া কাতর, তখন পিতা সোলায়মান আলীর মধ্য দিয়ে রোকেয়ার শৈশব বর্ণনার ফলে গল্পের গতি ভারসাম্য হারিয়ে শ্লথ হয়ে পড়ে। সোলায়মান আলীর ভাবনার এ অংশ তাৎপর্যপূর্ণ :

> মেয়েটা ভীষণ জেদী। তবে বড়ো মায়া, বাপের জন্যে, স্বামীর জন্যে, ছেলের জন্যে বড়ো মায়া তার মেয়েটার। তাই একটুকুতেই এত ভেঙে পড়ে। (পৃ-৫৬)

লেখক সোলায়মান আলীর ভাবনায় শৈশবকালের প্রবণতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে রোকেয়ার মানসগঠন সম্পর্কে ধারণা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তখন পাঠকের আগ্রহ রোকেয়ার ভাবনা এবং খোকনের অবস্থার দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় শৈশবের বিবরণ বাহুল্য বোধ হয়। সত্যই খোকনের মৃত্যু হয়েছে কি না—এ জিজ্ঞাসায় পাঠকের স্নায়ু তখন টান টান; এ বর্ণনা তাকে শিথিল করে দেয়।

হাসপাতালে খোকনের গোঙানির মধ্য দিয়ে গল্প শেষ হয়। ইলিয়াসের গল্পের সমাপ্তির যে বৈশিষ্ট্য, তা এখানে অনুপস্থিত। তাঁর গল্প আকৃতি ও প্রকৃতিতে একটি সমগ্রতা-আকাঙ্ক্ষী। এ গল্পের সমাপ্তিতে সে সমগ্রতা ব্যাহত হয়েছে। তবে অন্য একটি দিক থেকে বিবেচনা করলে এ ধরনের সমাপ্তির একটা কারণ খুঁজে নেওয়া যায়। রোকেয়া ভেবেছিল, সে পৌঁছতে পারলেই খোকনের সব বিষ-বেদনা মুছে ফেলতে পারবে। কার্যত খোকন মাকে যেমন চিনতে পারেনি, মাকে দেখে তার কষ্টও লাঘব হয়নি সংগত কারণে। দুই দিনব্যাপী মায়ের যে অন্তর্জ্বালা ও ভাবনা, বাস্তবে তার কিছুই স্বীকৃত হয়নি—মায়ের এ বেদনার মধ্য দিয়েই গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে, এ বিবেচনায় সমাপ্তি খুব অসংগত হয়নি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বেড়ে উঠেছেন পুরান ঢাকায়। এ এলাকার ইতিহাস, মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ। অভিজ্ঞতা শিল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—পুরান ঢাকার মানুষ এবং তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা পুরান ঢাকাকে পটভূমি করে লেখা গল্পগুলোকে ঋদ্ধ করেছে। এখানকার জীবনযাত্রা ইলিয়াসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যে কয়টি গল্পে ধরা পড়েছে, সেগুলোর মধ্যে 'ফেরারী' একটি। বৃদ্ধ ইব্রাহিম ওস্তাগরের ফেলে আসা জীবন, তার মনোবিকার ও তার যুবক সন্তান হানিফের পুরান ঢাকার বদ্ধ পরিবেশ থেকে পলায়নের কথা বলতে গিয়ে ইলিয়াস এ গল্পে সরু

গলি-উপগলিতে, দুর্গন্ধময় পরিবেশে, যেখানে 'মানুষ, মেয়ে মানুষ, কুকুর ও মেয়ে কুকুরের অহিংস সহাবস্থান', যেসব মানুষ মানসিক সংকীর্ণতা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের মনের ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতাকে ভয়ানকভাবে উপস্থিত করেছেন। যে পরিবেশে ও যে অর্থনৈতিক অবস্থায় হানিফদের বাস, সেখানে ইব্রাহিম ওস্তাগরের পক্ষে যৌবনে জীনপরি দর্শন ও তার লোমহর্ষক স্মৃতি নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং হানিফের পক্ষে জীনপরি না দেখার আফসোস নিয়ে কোনোরকমে জীবন কাটানো সম্ভব হয়।

ইব্রাহিম ওস্তাগরের মনোবিকৃতি বর্ণনায় 'ফেরারী' গল্পের সিংহভাগ ব্যয়িত হলেও তা এ গল্পের মূল বিষয় নয়। লেখক পূর্ববর্তী প্রজন্মের স্বপ্নাহত জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের অর্থাৎ সবদিক থেকে ব্যর্থ হানিফ, রাহাজানি মাস্তানি সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ডামলালু, সালাউদ্দিন, আহসানউল্লা—অর্থাৎ তরুণ সম্প্রদায়ের জীবনভাষ্য। ভাবীর খোটায় বিপর্যস্ত হানিফ জীবনে একবার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, হাইজাক করে বেঁচে থাকা ডামলালুর সঙ্গী হবার সুযোগ পেয়েও চরম অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সে পুলিশ ভেবে বিভ্রান্ত হয়, ডামলালুর ভাষ্যে উঠে আসে ছাত্রদের পড়ালেখার বদলে ভিন্নতর কর্মতৎপরতার বিবরণ :

> হোটেল থাইকা সায়েবরা বারাইবো মাল টাইনা, অরা হেই গাড়িগুলি ধইরা মালপানি কামায়, মাগীউগি পছন্দ হইলে ময়দানের মইদ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়। অহন বুজলি হালার বাঙ্গুচোদা, বুঝলি? দিনতো অহন হালার ইস্টুডেন গো। (পৃ-৬৯-৭০)

হানিফ যেমন ডামলালুর কাছে অক্ষম, ডামলালুরা তেমনি অক্ষম তথাকথিত শিক্ষিত মাস্তানদের কাছে। একইসঙ্গে সাহেবদের সবান্ধবী ক্লাবে যাবার কথা বলে লেখক পুরো ঢাকা শহরের নাজুক অবস্থা ও যুদ্ধোত্তর কালের নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেন।

ঢাকা শহরের চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা, 'ঢাকার হাসপাতালগুলি মানুষ মারার ফ্যাক্টরি' (যোগাযোগ)। এ গল্পের আক্রমণের লক্ষ্য সরাসরি ডাক্তার। ৪০ টাকা ভিজিটের চুক্তিতে একজন বড় ডাক্তারের আগমন ঘটে ইব্রাহিম ওস্তাগরের বাড়িতে :

> গম্ভীর ও অসন্তুষ্ট মুখে ইব্রাহিমের নাড়ি টেপে ডাক্তার। বুকে স্টেথেসকোপ লাগায়, জিভ দেখে ও শেষ পর্যন্ত নিজের নাম ও দু'লাইন ডিগ্রী ছাপানো প্যাডে প্রেসক্রিপশন লেখে। (পৃ-৭৫)

রোগী দেখে ডাক্তারের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা ও দুলাইনের ছাপানো ডিগ্রির কথা বলে লেখক 'অভিজাত' ডাক্তারের সঙ্গে রোগীদের সামাজিক ব্যবধান

এবং ডাক্তারের উন্নাসিকতাকে বুঝিয়ে দিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হানিফের বড় ভাই হান্নান, যার হাতে সদ্য কাঁচা পয়সা আসতে শুরু করেছে, সে প্রভুভক্ত কুকুরের ল্যাজের মতো নাড়ায় জিভকে, এতে তার পদলেহী মনোভাব, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় :

> বহুত পুরানা আমলের ঘরবাড়ি স্যর। ডাম্প স্যর। আনহাইজিনিক স্যর। ওল্ড ঢাকা খুব ন্যাস্টি স্যর। আমি স্যর মালীবাগে বাড়ি করতাচি, দোয়া কইরেন স্যর। (পৃ-৭৫-৭৬)

'উৎসব' গল্পে এমন প্রভুভক্ত কুকুর চরিত্রের এক অধ্যাপককে দেখেছি। এক আমলাকে দেখে তার যে অবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইলিয়াস লেখেন :

> তার আত্মচরিত বর্ণনা করবার প্রধান ইন্দ্রিয় জিহ্বা রূপান্তরিত হয় একটি ল্যাজে, লোমহীন ছোটো ল্যাজ মুখগহ্বরে ধ্বনিপুঞ্জে কি কারুকাজ করে ... (পৃ-১৭)।

এ গল্পে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের নির্লিপ্তিতে বিস্মিত হই। গল্পের শুরুতে মৃত্যুপথযাত্রী বাবার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার খুঁজে না পেয়ে হানিফ নিরুত্তাপ ক্যারাম খেলা দেখে। 'তর বাপে মরছে?'—এ প্রশ্নের উত্তর দেয় হানিফ এভাবে, 'ড্ ডাক্তাররে পাইনা, ম্মউতরে ক্যামনে ঠ্যাকাই?' (পৃ-৬৫)

ওস্তাগরের দুই ছেলে, এক মেয়ে ও জামাই তার অসুস্থতার জন্য যত না উদ্বিগ্ন, তার চেয়ে তার ও জিনপরির মধ্যে সংঘটিত হবে, এমন কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করে। এভাবে জীবনযাপন ও মানসিকতার মধ্যে চরম অস্বাভাবিকতা প্রকট হয়ে ওঠে।

এই পরিবেশ থেকে কারও কারও পালানোর ইচ্ছা জেগে ওঠা স্বাভাবিক, কিন্তু সে পথও যে খোলা নেই—তা-ও ভয়াবহ সত্যরূপে প্রতিভাত। তিলাওয়াতের জন্য রাতে পাতলা খান লেন থেকে কোরআন শরিফ বুকে চেপে হানিফ হাঁটা শুরু করলে বাপের একদা জিনপরি, শাহজাদি ও কবন্ধ দেখার গল্প মনে পড়ে যায়। কোরআন শরিফ থাকলে ওদের নাম পর্যন্ত কাছে ঘেঁষতে পারে না—এ বিশ্বাসে যে অতিপ্রাকৃত ভয়কে তাড়াতে তাড়াতে নিজের বাড়ির সামনে আসতে পারলেও দেখা যায়, তার প্রকৃত ভয় অপেক্ষা করে এখানেই। বাপের মৃত্যুর ফলে যে সমবেত কান্নার ধ্বনি—তাকে সে সহ্য করতে পারে না। শিথিল ও অবসন্ন আঙুলের ফাঁক দিয়ে কোরআন শরিফ গড়িয়ে পড়ে[৩], আর এসব পেছনে রেখে সে পালাতে থাকে।

হানিফ আসলে কেবল একটি মৃত্যুদৃশ্য ও সমবেত বিলাপের কাছ থেকেই

পালাতে চায় না, এটি তার সমগ্র জীবন থেকেই পালানোর দ্যোতক।

ক. এখানে এতো চাপা গলি, এপার ওপারে বাড়িগুলো একটু এগিয়ে এলেই তাদের সংঘর্ষের ফলে পথচারীদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। (পৃ-৮৬)

খ. এখানে মানুষ-কুকুরের মলমূত্রের মিলিত ঘ্রাণ লক্ষ্মীবাজারের খানিকটা, একদিকে কলতাবাজার ও অন্যদিকে নর্থব্রুক হল রোডের ১টা অংশ গেঁথে রেখেছে এক সূত্রে। (পৃ-৮৫)

মানুষ ও কুকুরের অবিচ্ছিন্ন জীবনযাপন, মলমূত্র, সঙ্গম-উল্লাস একসূত্রে গাঁথা থাকে বলে মানুষকে ইতর পশু থেকে পৃথক করা মুশকিল হয়ে পড়ে। চাঁদের দিকে চেয়ে ডাস্টবিনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা 'ধূসর' 'নবীন' কুকুর অবরুদ্ধ জীবন-প্রতিবেশে এক-একজন ব্যর্থ মানুষের প্রতিভূ হয়ে পড়ে। কুকুরের প্রতি প্রয়োগকৃত 'ধূসর' ও 'নবীন' বিশেষণ দুটো এ ধারণাকে জোরালো করে। আবার ৪০ পাওয়ারের বাল্বের নিচে ডাম্প ঘরে ঝুলকালির অভ্যন্তরে কুণ্ডলী পাকিয়ে যারা ঘুমায়, তাদের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার আলো কতটুকু পৌঁছেছে, সহজেই অনুমেয়। ফলে বেকার যুবক হানিফের, ডামলালুদের সঙ্গে মাস্তানিতে যে তার এতটুকু যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি, এখান থেকে তার, পূর্বপ্রজন্মের শেকড় কেটে যাওয়ার পর পালানো ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু ইব্রাহিম ওস্তাগরের মনোবিকৃতি ও তার মৃত্যু-উত্তর সমবেত বিলাপ থেকে সে রেহাই পায় না। কারণ, ইব্রাহিম ওস্তাগর তার 'করোটি জুড়ে একটার পর একটা ইট গাঁথতে শুরু করে। হানিফের বেটে শরীরে বাঁশের মই জুড়ে দিয়ে ইব্রাহিম ওস্তাগর' উঠে যায় তার মাথায়। মূলত ইব্রাহিম ওস্তাগরের অবরুদ্ধ জীবন থেকে তার রেহাই নেই, তার মনোবিকৃতিও অনিবার্য। তার অন্বেষণের বিষয় হয়ে ওঠে কারাগার। ডামলালুর মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে হলেও থানার দারোগার হাতে আটক হওয়ার সংকল্প করার মধ্য দিয়ে তার পালানোর পথপরিক্রমা শেষ হয় সূত্রাপুর থানার সামনে। আসলে তার জন্য কোথাও শান্তি বা মুক্তি অপেক্ষা করছে না। তাই সে কারাগারকে পুরান ঢাকার ইতর জীবনযাপনের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ মনে করেছে।

'ফেরারী' গল্পে হানিফের পালানোর মধ্য দিয়ে লেখক সমগ্র পুরান ঢাকাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন এবং বিশদ দেখিয়েছেন। বিশদ বর্ণনা ইলিয়াসের স্বভাবের অন্তর্গত; কিন্তু এতটা বিস্তারিত বর্ণনা, বিশেষত পুরান ঢাকার অলিগলির, আর কোনো গল্পে পাওয়া যায় না। গলি-উপগলির নামের সঙ্গে সঙ্গে তার কুকুর-বিড়াল-ডাস্টবিন, দোকান, সাইনবোর্ড, দোকানের নাম্বার তাঁর চোখে ধরা পড়ে অবলীলায়। হানিফ নবদ্বীপ বসাক লেনের মাথায় এসে দেখে :

বঙ্গলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার/এখানে খাঁটি দুধের ছানায় প্রস্তুত রসগোল্লা, অমৃতি, পান্তুয়া, সন্দেশ প্রভৃতি পাওয়া যায়/ পরীক্ষা প্রার্থনীয়/ ১১/বি/৩ সুভাষ বোস এভিনিউ/লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১। (পৃ-৮৫)

এ রকম একাধিক সাইনবোর্ড, স্কুলের বর্ণনা আছে এ গল্পে। মিউনিসিপ্যালিটির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো কাঠচাঁপা গাছ ও সেন্ট ফ্রান্সিসের কাছে ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়ানো কুকুরটিও তাঁর নজর কাড়ে। গাছের সংখ্যা ৪/৫, কুকুরটি মেয়ে কুকুর—এ বর্ণনার পেছনে ইলিয়াসের অনুসন্ধানী চোখ থাকলেও হানিফের পালানোর সঙ্গে তা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না। হানিফ যেসব গলি-উপগলি অতিক্রম করেছে, তার একটা তালিকা : নবদ্বীপ বসাক লেন, সুভাস বোস এভিনিউ, নর্থব্রুক হল রোড, শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী লেন, কে.জি. গুপ্ত লেন, পাতলা খান লেন, ঈশ্বর দাস লেন, রূপচাঁদ লেন, শুকলাল দাস লেন, রূপলাল দাস লেন, দেবেন্দ্র দাস লেন, পাঁচ ভাই ঘাট লেন, ফরাশগঞ্জ লেন, মদন সাহা লেন।

'ফেরারী' সম্পর্কে হাসান আজিজুল হকের অভিযোগ, এ গল্পের চরিত্রগুলো নিখুঁত, কিন্তু গল্পের কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে গল্পন্যায়ে আবদ্ধ নয়।[৪] কিন্তু বিলীয়মান ইব্রাহিম ওস্তাগরের চেয়ে চলমান হানিফ এবং তার প্রতিবেশ-কাল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার সংকটকে ইলিয়াস কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন বলে তার একটা মানচিত্র বিশদভাবে আঁকতে চেয়েছেন। সেসব যে সব সময় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি, তা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে। পলায়নকারী হানিফকে নিয়ে কী করবেন—এ সংকট লেখককে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল, সে ক্ষেত্রে থানাকে উপস্থিত করে একটা প্রতিতুলনার বোধ জাগাতে চেয়েছেন লেখক, সে প্রতিতুলনায় কারাগারের নির্মম জীবনের চেয়ে হানিফদের জীবনযাত্রা নিষ্ঠুরতম।

অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬) গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পের পটভূমি ঢাকার অদূরে অবস্থিত একটি মফস্বল শহর। আধঘণ্টা হাঁটলে যে শহরকে এমাথা-ওমাথা ফালা ফালা করা যায়। '৭৫ পূর্ববর্তী ঘটনাবলি নিয়ে সেই সময়েই এটি রচিত। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দলের অমনোযোগ ও প্রশ্রয়ের ফলে এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রসংগঠনের গুটিকয়েক নেতা ও কর্মী নানা রকম অপকর্ম চালায়। তাদের চাঁদা আদায় ও কলেজগামী মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার ঘটনায় ব্যবসায়ী ননীদার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। মনে রাখা যায়, '৪৭-এর ভারত বিভক্তির পর হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক ভারতে চলে গেলেও অনেকে থেকে গেছেন এখানে ভিটেমাটি কামড়ে। উপায়হীনতার পাশাপাশি অনেকের মধ্যে যে নিরেট স্বদেশপ্রেমও কাজ করেছে এই না যাওয়ার পেছনে,

তা স্বীকার করতে হবে। পিসীমা কিংবা প্রদীপের বাবার মধ্যে এ সত্য ইলিয়াস ধারণ করেছেন। পাকিস্তান আমলে চব্বিশ বছর এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এরা অপেক্ষাকৃত বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আশা করা গিয়েছিল, সংখ্যালঘু হিসেবে এদের ওপর যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক চাপ গেছে, স্বাধীনতা লাভের পর তার অবসান হবে। '৭২ সালের সংবিধানে অসাম্প্রদায়িকতার কথা স্বীকৃত হলো। কিন্তু কার্যত স্বাধীন দেশের প্রথম সরকার সেই চাপ সরাতে পারেনি। তার চিত্র 'খোঁয়ারি' (১৯৮২) গল্পে ভালোভাবেই আছে। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'ও বিষয়টি ধারণ করেছে। স্বাধীনতার পরও রাজনীতির নামে যে অরাজনৈতিক, অনৈতিক কর্মকাণ্ড চলেছে, ননীদা তার শিকার। কিন্তু এ গল্পে উজ্জ্বলতর করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে ক্রমশ পরিবর্তমান জীবনের ভেতর বেঁচে থাকা পূর্বপ্রজন্মের একজন পিসীমাকে, যিনি সমকালের জীবন-প্রতিবেশে বাহুল্য, বাতিল হয়ে গেছেন, কিন্তু বেঁচে আছেন পূর্ববর্তী নানা ঘটনা-অনুভূতির সাক্ষী হয়ে।

গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, ননীদার কাছে কলকাতা থেকে দুদিনের জন্য বেড়াতে আসা প্রদীপ মুখোমুখি হয় কনফারেন্সের নামে তরুণদের চাঁদা আদায়ের ঘটনার। ননীদার দোকানে এসে শুরুতেই তাকে বুঝতে হয়, এখানকার হার্ডওয়্যার ফার্মের নাম লেখা ক্যালেন্ডারে রবীন্দ্রনাথের ছবি যেমন-তেমনভাবে ঝুললেও আরেক দিকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি 'দামী ফ্রেমে বাঁধানো' থাকা চাই। অচিরেই স্বাধীন দেশে আবদ্ধ, সহনশীল ননীদার আক্ষেপ ঝরে পড়ে প্রদীপের কাছে :

> সপ্তার মধ্যে তিনখান চাইরখান কনফারেন্স, সম্মেলন, সমাবেশ লাইগাই রইছে। পয়সা আদায়ের ফন্দি, বুঝলি না? এই ভাই আইবো, বাপে আইবো, বন্ধু আইবো! আরকি? ছাড়ো মালপানি ছাড়ো। (পৃ-৯২)

ছেলের বয়সী মাস্তানদের চাঁদা দেওয়া ও তোয়াজ করা সত্ত্বেও তাদেরই ভয়ে কলেজপড়ুয়া মেয়ে যখন রাস্তায় বেরোতে পারে না, তখন ননীদার স্ত্রী অনেক হিন্দুর মতো ইন্ডিয়া চলে যাওয়া ছাড়া পথ দেখেন না। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী ছেলে অমিত পর্নোগ্রাফির মধ্যে স্বস্তি খোঁজে। আর প্রদীপের বিধবা পিসীমা মৃত বড় ভাইয়ের দেশপ্রীতি, স্নেহ, পুরনো স্মৃতি আর পূজা-কৃষ্ণকীর্তন নিয়ে বাড়ির পুরনো দালানে পড়ে থাকেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। অস্তিত্বের সংকটে বিপর্যস্ত, ক্ষয়ে যাওয়া ননীদার সংসারে পিসীমা সত্যিই এক 'সেকেলে' স্বর। এই প্রাচীন বৃদ্ধা বেঁচে থাকেন অন্য ঘরে অন্য স্বর হয়ে। প্রদীপের সঙ্গে পিসীমার কথোপকথনে বারবার চলে আসে মৃত বড় ভাই অর্থাৎ প্রদীপের

বাবা; তার সংগত কারণও খুঁজে পাওয়া যায়। বিধবা হয়ে যাওয়ার পর ছেলেসন্তানসহ বোনকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন তিনি। পিসীমার ভাষ্য : 'আমার কপাল পুড়ছে পর দাদায় মাছ ছাড়লো। কত কইছি, হুনছেনা।' (পৃ-৯১) বাড়ি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না তিনি। ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য তাকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পিসীমা জীবনযাপনে, মানসিকতায় তারই উত্তরসূরি। যুদ্ধের সময় সবাই আগরতলা পালিয়ে গেলেও পিসীমা যাননি। 'বাবায় দ্যাহ রাখছে, আমার বয়স তহন সাত আট বছর; দাদায়তো আমাগো বাপ হইছে' (পৃ-৯৮-৯৯)—পিসীমার কী সরল স্বীকারোক্তি! মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে বিকাশমান জনজীবনে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও শিথিল সম্পর্কের মধ্যে তাদের সেই নিবিড় নির্ভরতা-আন্তরিকতা-ভালোবাসার সম্পর্কের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া সে প্রজন্মের পিসীমাদের আর কোনো অবলম্বন নেই—এ কথা ইলিয়াস অত্যন্ত মমতা নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। অন্যভাবে আরেকবার এ রকম উপলব্ধি দেখব কামাল উদ্দিনকে নিয়ে, 'দোজখের ওম' গল্পে। এই নিঃসঙ্গ-অবলম্বনহীন জীবনে মাঝরাতে প্রদীপকে পেয়ে পিসীমার আবেগ উথলে ওঠে। প্রদীপের মধ্যে তার দাদার ছায়াকেই অন্বেষণ করেন তিনি।

সময় এগিয়েছে, পুরনো অনেক কিছু বাতিল করে দিয়েছে অগ্রগামী সময়। কিন্তু মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত জীবন খুঁজে পায়নি। বেড়ে গেছে তার অস্তিত্বের সংকট ও অস্থিরতা। ব্যবসার নামে প্রদীপের কলকাতা-বাংলাদেশ-আগরতলা ঘুরে বেড়ানো সেই অস্থিরতা ও সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ। ফলে পিসীমা যেমন প্রদীপের মধ্যে তার স্বস্তিকর অতীত খুঁজে বেড়ান, তেমনি প্রদীপও কিছু খুঁজে ফেরে পিসীমার মধ্যে। পিসীমার ভেজে দেওয়া মুড়ি খেতে খেতে কলা-শশা-চন্দন-ধূপধুনো-কর্পূরের গন্ধ-আবৃত শালগ্রাম-শিলা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ছবি আকীর্ণ পিসীমার ঘর তার কাছে এলোমেলো হয়ে যায়, পিসীমার মুখ গলে যায়, 'মস্তবড়ো অপরিচিত একটি শূন্যতায় শরীরমুক্ত তরল পিসীমা তার ধোঁয়াচ্ছন্ন কেশরাশি এলিয়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে' দেখে সে 'মা' বলে চিৎকার করে ওঠে। আসলে প্রদীপ কেবল পিসীমাকেই নয়, এই ভালোবাসা-প্রেমময় বাঙালি জীবনের, বাবা-মা-পিসীমাদের প্রজন্মটাকেই নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখে, এবং পিসীমার নিগূঢ় ভালোবাসার মধ্যে হারানো মায়ের জন্য তার আর্তনাদ প্রকাশ করে।

জীবনের প্রতি সূক্ষ্ম অভিনিবেশের ফলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বুঝতে পারেন শেষ পর্যন্ত প্রদীপরা আর পিসীমাদের, অর্থাৎ ওই পূর্ববর্তী প্রজন্মের

মানুষের সঙ্গে ঐক্য রাখতে পারে না স্বাভাবিক নিয়মেই। তাই নিজের ঘরে এসে জানালা বন্ধ করে দিলে পিসীমার যদি 'গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো, আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, নয়ন ভরিয়া দেখি'—ইত্যাকার গান ল্যাজ গুটিয়ে বাইরে চলে যায়। ইলিয়াস তাঁর স্বাভাবিক ছন্দে চলে আসেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের রাজনৈতিক অবক্ষয়জনিত অব্যবস্থার করুণ চিত্র 'খোঁয়ারি' গল্পে পাওয়া যাবে। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে ইলিয়াস বিষয়টি বিশদ না করে ব্যক্তি-অস্তিত্বের ক্রম-বিচ্ছিন্নতা আর দৌড়ের ভেতরে পূর্বপ্রজন্মের এক বৃদ্ধা, যিনি মূলত পুরনো দালানে, অন্য ঘরে, অন্য স্বর নিয়ে বেঁচে আছেন, তাঁর সে প্রজন্মের শেষ প্রতিনিধির অস্তিত্বের বিলীয়মান অবয়ব বর্তমান প্রজন্মের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছেন।

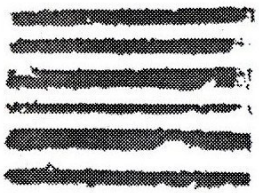
তথ্য-সংকেত

১. হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা*, ১৯৯৪ ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : পৃ-২৬

২. রোকেয়ার মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে দুই ধরনের তথ্য দেওয়া হয়েছে। ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, মা মারা গেছে ৩ বছর আগে। ৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'রোকেয়ার মা মারা গেছে চার/পাঁচ বছর আগে।' অবশ্য এ তথ্যবিভ্রাট গল্পকে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*: দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮ : ইউপিএল, ঢাকা)

৩. ইলিয়াসের এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, হাত থেকে কোরআন শরিফ পড়ে যাওয়ার এই দৃশ্যের জন্য কোনো কাগজ এ গল্প ছাপেনি। এটি সরাসরি বইয়ে দেওয়া হয়েছে। *লিরিক*: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৯ চট্টগ্রাম। পৃষ্ঠা-১৪৩। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শাহাদুজ্জামান।

৪. হাসান আজিজুল হক : প্রাগুক্ত, পৃ-১০৮।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খোঁয়ারি

মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের (১৯৭২-৭৫) রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কথা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের উপান্তে আভাসিত হয়েছে। 'খোঁয়ারি' গল্পে তার বিশ্বস্ত উপস্থাপনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর*-এর শেষ গল্প 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'; তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *খোঁয়ারির* (১৯৮২) প্রথম গল্পই হলো 'খোঁয়ারি'। গল্প দুটি পাঠ করে মনে হয়, 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' যেখানে শেষ, 'খোঁয়ারি' গল্পের শুরু সেখানেই।[১] 'খোঁয়ারি' গল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে তাই পেছনের দিকে তাকানোর প্রয়োজন পড়ে।

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে দেখা যায়, বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল শেষ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে সংখ্যালঘু কিংবা নিম্নশ্রেণীর-অন্ত্যজ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের নবগঠিত সরকারও পারেনি। যুদ্ধোত্তর কালের একটি নবগঠিত সরকারকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে সময় দিতেই হয়, কিন্তু প্রশ্নটি সেখানে নয়, প্রশ্নটি হলো, পুনর্গঠনের নামে সরকারের ছায়ায় লালিত যুব ও ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের নানা ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ নিয়ে। সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—এই শ্লাঘা সংগঠনের কর্মীদের বিনয়ী না করে তাদের কর্তৃত্ববাদী, অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু ও অলস করে তোলে। বিষয়টিকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে স্পর্শ করেছেন; 'খোঁয়ারি' গল্পে এর মর্মান্তিক, বেদনাবহ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

রাজনীতির নামে, ইউথ অর্গানাইজেশনের নামে যুবকর্মীদের হিন্দু বন্ধুর বাড়ি দখল, মদ্যপান-বিলাসিতা, নানা সুবিধা আদায়, বহু রকমের লাম্পট্য 'খোঁয়ারি' গল্পের বিষয়। এ গল্পে ইলিয়াস একইসঙ্গে ধারণ করেছেন এক সময়কার একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের নানা ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতে অপস্রিয়মাণ আভিজাত্যের মর্মন্তুদ চিত্র। গল্পে দেখা যায়, পুরান ঢাকায় যুবসংগঠনের অবস্থা ভালো যাচ্ছে না বলে সংগঠনের পুরনো কর্মী সমরজিৎদের বিশাল বাড়ির একতলাটা সংগঠনের অফিসের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমরজিতের পুরনো বন্ধু যুবনেতা ফারুক যুবকর্মী জাফরকে নিয়ে আসে রাতে সমরজিতের বাড়িতে। রাস্তা থেকে জুটিয়ে আনে আরেক পুরনো বন্ধু ইফতিখারকে। ইফতিখারের সঙ্গে তারা শঠতার চূড়ান্ত করে তাকেসহ নিয়ে এসে সমরজিতের দোতলায় বসে হুইস্কি পান করে। বলা বাহুল্য, ওই হুইস্কি সমরজিৎকেই জোগাতে হয়। এই পর্বে ফারুক এবং জাফর প্রথমে ইনিয়ে-বিনিয়ে ও পরে আদেশের সুরে এই বাড়ি পার্টিকে না দিয়ে যে সমরজিতের উপায় নেই, সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে চলে যায়। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে পার্টির যে দুজন চাঁদা আদায়কারীকে আমরা দেখেছি, তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায় না। এ গল্পে ফারুক-জাফরের পরিচয় স্পষ্ট। তবে দুই গল্পেই তাদের পোশাক-আশাক ও অন্যান্য বর্ণনায় এদের লেখক একাকার করেছেন। লেখক 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-এর চাঁদা আদায়কারী দুজনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> ২জনেরই বেল বটম প্যান্ট; ১টার প্যান্ট নীল রঙের, সামনে পেছনে জোড়া জোড়া পকেট। তার পরনে কারুকাজ করা গলা-উঁচু পাঞ্জাবি। গোঁফওয়ালার অজস্র বোতাম খচিত, পকেটে-ফ্ল্যাপ পুরু কাপড়ের শার্ট ও খয়েরি রঙের সিনথেটিক কাপড়ের প্যান্ট। কথাবার্তা যাই বলুক, বাঙাল ছোকরাদের কাপড়ের খুব বাহার। (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*: দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃ-৯০-৯২)

এভাবে ইলিয়াস তাদের রুচিহীনতা ও অজ্ঞতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'খোঁয়ারি'তে তরুণ নেতা জাফর সম্পর্কে :

> এই কণ্ঠস্বর তার বেলবটম বড় কলারের খবর-কাগজ আঁটা শার্ট, গলায় ঝোলানো চেন এবং সদাপ্রস্তুত ও সপ্রতিভ চেহারার সঙ্গে বেমানান। (*খোঁয়ারি*: দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৯৮৯, পৃ-১২)

যখন এসব নেতা বিভিন্ন জায়গায় বিরানি খেয়ে আর বিয়ার স্কচ-হুইস্কি পান করে বেড়াচ্ছে, তখন জিনিসপত্রের দাম চলে যাচ্ছে মানুষের নাগালের বাইরে। লেখক বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে ব্যঙ্গপ্রবণ হয়ে উঠেছেন, এনেছেন

রজনীগন্ধার টবে গজিয়ে ওঠা গাঁজার চারার প্রসঙ্গ। সমরজিতের ভাবনা: 'গোবিন্দ শালা দুটাকার গাঁজা দিয়েছে, আগে চারআনাতেও এর চেয়ে বেশি পাওয়া যেতো।' (পৃ-৩৮) আবার যখন লেখক এই তথ্য আমাদের জানিয়ে দেন 'এইটুকু মালে বিচি কতো। এরকম ফেলে-দেওয়া কোনো বিচি থেকে রজনীগন্ধার টবে এই গাছ গজিয়েছে। মাঝখান থেকে রজনীগন্ধার চারাটা মরে গেলো।' (পৃ-৩৮) তখন আমরা বুঝতে পারি, রাজনীতি কিংবা তরুণসমাজের মধ্যে নেই আর রজনীগন্ধার সৌরভ, অবক্ষয় ও লোভ তাদের সৌরভকে আড়াল করেছে।

নেতাদের মূল লক্ষ্য সমরজিৎদের যে বাড়ি, শত বছর বয়সী সে বাড়ির দেয়ালে চিড় ধরেছে। এ বাড়িতে আলাদা আলাদা ঘরে একদিন আমিষ-নিরামিষভোজীদের পৃথক রান্না হতো, ঠাকুরের ভোগ রান্না হতো যে ঘরে সে ঘরেই ছিল আলাদা কুয়ো; বাড়িতে ছিল নাটমন্দির, নবাব সাহেবজাদারা একদিন আসতেন এ বাড়িতে, শতবর্ষের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসের উত্থান-পতন, ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে সঙ্গে শতবর্ষের বাড়ির চেহারাও আজ বিধ্বস্ত। সেই পুরনো জৌলুশ-স্মৃতি-স্বপ্ন আজ পলেস্তারা খসে যাওয়া দেয়ালে দেয়ালে গেঁথে আছে। কিন্তু এই অপসৃত আভিজাত্যের নিঃশেষটুকুর মধ্যেও সমরজিতের মাতাল পিতা অমৃতলাল, যিনি কোনো অবস্থাতেই পার্টিকে বাড়ি দিতে সম্মত নন, তিনি কিংবা সমরজিৎ নিজে, যে এ পার্টির দীর্ঘ সময়ের কর্মী এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের সাফারিংয়ের কথা ফারুকরা জানে, তারা এতটুকু শান্তি বা স্বস্তিতে নেই। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা যুদ্ধোত্তর কালে দেশকে পুনর্গঠিত করার নামে কতটা লাম্পট্য চালায়, ৩১ পৃষ্ঠার এ দীর্ঘ গল্পে সমরজিৎদের বাড়িতে তাদের হাঁটাচলা-কথোপকথন, মদ্যপানের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস পর্দা খুলে দেখিয়েছেন।

জাফর সমরজিতের বন্ধু, কিন্তু চতুর। তার কথায়, সমরজিতের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সাবভারসিভ এলিমেন্টেস বিপ্লবের নাম করে কিংবা গভর্নমেন্টের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশকে কেউ যেন ধ্বংস করতে না পারে, এটাই তাদের দেখার বিষয়! তার কথাতেই আবার, বাড়িটা পার্টিকে ভাড়া না দেওয়া সমরজিৎদের 'সাবভারসিভ' করার নামান্তর। এদের পেছনে আছে জনৈক মানিক ভাই, প্রতাপশালী, যিনি মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু কখনো ফ্রন্টে যাননি।[২] 'প্রতিশোধ'[৩] গল্পে যুদ্ধ না করে মুক্তিযোদ্ধা সেজে, নেতা হয়ে সুবিধা আদায় করতে দেখা গেছে আনিসকে। মানিক ভাইয়ের মতো 'মুক্তিযোদ্ধা-নেতা' নিজের স্বার্থে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়ে রাখেন। সঙ্গে আসা

জাফরকে মাস্তান মনে করে ফারুক। তার ভাবনার মধ্যে ধরা পড়ে তরুণ মাস্তানদের ক্ষমতা আর অদৃশ্য মানিক ভাইয়ের চরিত্র : 'এইসব নবজাগ্রত তরুণ মাস্তানদের কিছু বলবার জো আছে? মানিক ভাই কাকে যে কার পেছনে লেলিয়ে রেখেছে, কেউ বলতে পারে না।' আবার অধিকতর তরুণ জাফরদের মধ্যে এসব পুরনো যুবকর্মীদের প্রতি আস্থা নেই বিন্দুমাত্র; সে এদের প্রতি ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। তার ভাবনার মধ্য দিয়ে কেবল ফারুকদের মতো নেতার নয়, যুদ্ধোত্তর কালের পুরো রাজনীতির চেহারাই মূর্ত হয় :

> রঙ্‌বাজি করে আর কতদিন? চরদিকে খালি শত্রু, যেখানে যাও, একটা না একটা ঘাপলা। অথচ কোনো সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না এরা, এদিকে ওয়ার্কিং কমিটিতে ঢোকার জন্য সব অস্থির। (পৃ-২১)

যাদের নিজেদেরই দেশ সম্পর্কে কোনো যথার্থ মাথাব্যথা নেই, তারাই প্রকারান্তরে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে সমরজিৎদের। মানিকভাই 'ইডিওলজির জন্য' যেকোনো অপ্রিয় কাজ করতে পারেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করতে রিফিউজ করেছো শুনলে হি (মানিকভাই) মে পুট ইউ ইনটু ট্রাবল, পরে কোনো অসুবিধে হলে আমি হেল্প করতে পারবো না।' পুরনো বন্ধু ফারুকের কণ্ঠে এমন কর্তৃত্ব ও চাতুর্য। সমরজিতের সঙ্গে যুদ্ধের পর নতুন পরিস্থিতিতে সামাজিক ও মানসিক দিক থেকে তার মেরুদূরত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে নেতার মতো চাতুরি ও দুধারি কথা, ব্যাংকের চাকরি ও বাড়ি উদ্ধারের নামে পুরনো বন্ধু ইফতিখারের কাছ থেকে টাকা খসানো, জাফরের প্রতি ঈর্ষা, সর্বোপরি মানিক ভাইয়ের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে ফারুককে সরকার ও মূল পার্টির ছায়ায় বেড়ে ওঠা একজন সুবিধাবাদী ও আধিপত্যবাদী লুম্পেন যুবনেতা হিসেবে সহজেই চেনা যায়। পাশাপাশি সরকার গঠনকারী মূল দলের দুর্বলতাগুলোও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দলটি যুদ্ধের আগে জাতীয় ইস্যুতে বাংলাদেশের বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেও যুদ্ধের পর জাতির সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে গঠনমূলক ও সুদূরপ্রসারী কিছু করতে পারেনি—পাকিস্তানের মতো আরেকটি বুর্জোয়া প্রশাসন ও নগরে-মফস্বলে কতিপয় স্বদেশি রাজনৈতিক লম্পট সৃষ্টি ছাড়া। 'খোঁয়ারি' গল্পে এই ব্যর্থতা ও অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করা যায়। গল্পের একটা বড় অংশ ব্যয় করা হয়েছে ইফতিখার, সমরজিৎ ও সমরজিতের বাবা অমৃতলালের স্মৃতিবর্ণনায়। মদ পেটে গেলে ইফতিখারের কী হয়, তার লম্বা ফিরিস্তি গল্পে খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি; গল্পের গতি শ্লথ এবং আয়তন বাড়িয়েছে মাত্র। বাড়ি এবং চাকরি উদ্ধারের আশায় মানিক ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ইফতিখার কলকাতায় মাকে পাঠানোর জন্য

রাখা টাকা বন্ধু ফারুকের পেছনে ওড়ায়। মাঝরাত পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকে আর এই উত্তর পায়, তা-ও জাফরের কাছ থেকে: 'আজ মানিক ভাই খুব বিজি থাকবেন। আপনি অন্য একদিন এ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন।'

লক্ষ্ণৌর এই উর্দুভাষী ফারুকের সঙ্গে কথা বলে বাংলায়, আর ফারুক তার সঙ্গে উর্দু বলে, 'সেন্টপার্সেন্ট' বাঙালি নয় বলে জাফর তাকে অবজ্ঞা দেখায়, সে হয়ে পড়ে স্মৃতিকাতর, বিমর্ষতা তার ঘোচে না কিছুতেই। স্মৃতিতে বা বিমর্ষতায় আক্রান্ত হয় ইলিয়াসের অনেক গল্পে কোনো না কোনো চরিত্র; এ গল্পে ইফতিখার ইলিয়াসের এ প্রবণতার পরিচয় বহন করছে।

তবে সমরজিতের স্মৃতিবর্ণনায় লেখক যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকালের ঘটনা উপস্থাপন করেছেন, তা সমরজিতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক, মর্মস্পর্শীও। যুদ্ধের সময় তাদের সাফারিংয়ের প্রসঙ্গ, মেশিনগানের গুলির নিচ দিয়ে পালানোর প্রসঙ্গ ফারুকই উত্থাপন করে; অতঃপর সমরজিতের চোখের সামনে দিয়ে সেলুলয়েডের মতো যে দৃশ্যমালা যাওয়া-আসা করে, তাতে দেখতে পাই, সমরজিৎদের বিশাল একান্নবর্তী পরিবার আত্মীয়স্বজনসহ ভারতের উদ্দেশে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করছে। পালানোর দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইলিয়াস একইসঙ্গে যুদ্ধের ভয়াবহতা, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বোধ, আপনাপন স্বভাব ও আর্তি নিপুণভাবে মূর্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে ইফতিখারের মদ্যপানোত্তর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা বাহুল্য মনে হলেও সমরজিৎদের পলায়নদৃশ্যের বর্ণনায় ইলিয়াস পুরান ঢাকার একটি প্রায় ভঙ্গুর বাড়ির দোতলায় বসা মদের আসর থেকে পাঠককে পৌঁছে দেন একেবারে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবহুল জ্যান্ত সময়ের মধ্যে। ঘটনাবলির সংঘটন দ্রুত, ভাষা টানটান—দুয়ের সমন্বয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে পাঠক এতটাই ওতপ্রোত হয়ে পড়ে যে, দীর্ঘ এ বর্ণনায় তাদের কোনো বোধ থাকে না, সে মূলত কোথায় আছে—সমরজিতের বাড়িতে, না যুদ্ধে। একটি বাক্যে পলায়নরত প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা: 'বৃষ্টির তোড়ে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। প্রত্যেকে ভাবছে, আর সবাই আছে একসঙ্গে, হায়রে দলছুট হয়ে পড়েছি কেবল আমিই।' (পৃ-৩২)

ইলিয়াসের সবদিক বিস্তারিত বর্ণনার প্রবণতা পাঠককে গল্পের মূল স্রোত থেকে কোথাও কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, তবে তাঁর গভীর দৃষ্টি, রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান, স্বদেশ-সমকাল-প্রতিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা—একইসঙ্গে যুদ্ধোত্তর কালের রাজনীতি আর ইফতিখার-সমরজিতের স্মৃতিকাতরতা ও বিষণ্নতাকে শেষ পর্যন্ত এক যৌক্তিক সমগ্রতায় আবদ্ধ করে। বিষণ্নতায় আক্রান্ত, হতাশ সমরজিৎ যখন বলে: 'খোঁয়ারির মধ্যে রাত কাটে, সারাটা

সকাল জুড়ে খালি খোঁয়ারি, অফিসে বইসা ঝিমাই, ভাল্লাগে না',—তখন পুরো বাংলাদেশকে আমরা খোঁয়ারির মধ্যে বন্দী অবস্থায় ঝিমোতে দেখি।

> আজো এ সমাজে একজন নারীর কোনো সামাজিক ভূমিকা নেই। তার শ্রম বা জীবনপাতের অর্থনৈতিক মূল্য বা স্বীকৃতি নেই—রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কবিতার সেই গৃহবধূর মতই রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার অর্থহীন চক্রাবর্তের ভেতরই তার জীবন নিঃশেষিত।[৪]

আমাদের সমাজে এখনো, নারী স্বাধীনতার রাজনৈতিক বুলির যুগেও এ কথা অনেকটাই সত্য। এ অবস্থায় বাংলাদেশে, তা-ও পুরান ঢাকার মতো একটি এলাকায় বিয়ের পর থেকে শুরু করে মরার আগ পর্যন্ত একজন নারীর জীবন বৈচিত্র্যহীন কেটে যাবে, তার ওপর প্রচুর অবিচার হবে; অবহেলায় জীবন তার অতিবাহিত হবে পশুর মতো সহানুভূতিহীন—এসব মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দুঃখজনক বটে, কিন্তু বিশেষ বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। এই প্রক্রিয়ার ভেতর জীবনযাপনকারী একজন মহিলার জীবনকে কেন্দ্রে রেখে গল্প রচনা করলে তাতে যদি বিশেষ কোনো মাত্রা যোগ করা না যায়, তবে সে গল্প গতানুগতিক হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা লক্ষ করি, পুরান ঢাকার একটা বাড়িতে পুরো একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া বৃদ্ধা আতমন্নেসার সমগ্র জীবন, তার ওপর যে বঞ্চনা-অনাদর-অবহেলা হয়েছে, তাকে 'অসুখ-বিসুখ'[৫] গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এমন এক ভঙ্গি ও পরিকল্পনায় উপস্থিত করেছেন যে গতানুগতিকতার গণ্ডি পেরিয়ে তা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। ব্যক্তিকে যুগপৎ তার সামাজিক ও মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে দেখা ইলিয়াসের স্বভাব। ফলত সে কখনো বিশেষ কোনো ভালো বা বিশেষ কোনো মন্দের প্রতিভূ হয়ে উপস্থিত হয় না, উপস্থিত হয় সমগ্রতা নিয়ে। নানা ধরনের বঞ্চনা ও অমনোযোগের ফলে বৃদ্ধা আতমন্নেসার যে মনোবিকৃতি ঘটেছে, ওই বঞ্চনার ইতিহাসসহ তা আমাদের সামনে উপস্থাপন ইলিয়াসের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি আতমন্নেসার প্রতি পাঠকের বিশেষ কোনো সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেন না; ফলে বঞ্চিত, বিকারগ্রস্ত আতমন্নেসার রিক্ত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার মানবিক স্বার্থপরতা ও হীনম্মন্যতাও কাদা-জলের মতো একাকার হয়ে তাঁর গল্পে ধরা পড়ে।

বিয়ের পর থেকে আতমন্নেসার শরীর-স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো, বড় ধরনের অসুখ-বিসুখ হতো না কখনো। মানুষ হিসেবে আতমন্নেসারও অসুখ-বিসুখ হতে পারে, এ সত্য স্বামীসহ পরিবারের কেউই আর বিশ্বাসের মধ্যে আনতে চায়নি। স্বামীর ছিল হাঁপানি, সারা জীবন নিজের হাতে তাকে

খাওয়াতে হয়েছে নানা রকমের ওষুধ। ৬/৭টা সন্তান হয়েছে তার, (ভয়, অসুস্থতা আর মনোবিকারের ফলে এখন সে আর সঠিক সংখ্যা মনে করতে পারে না, সবাই জীবিতও নেই) সন্তান প্রসবের সময়েও তার জন্য কখনো ওষুধ জোটেনি। সন্তান প্রসবের সময় হলে স্বামী তার ননদকে নিয়ে আসত, সে-ও এক রোগী, খেত নানা রকম ওষুধ। কিন্তু আতমন্নেসার গর্ভধারণ ও প্রসবের ঘটনা কারও কাছেই গুরুত্ব পায়নি। ডাক্তার-ওষুধের কথা দূরে থাক, পাড়ার সাবিত্রি দাইকে ডাকতেও তারা অনীহ। ছেলে হয়েছে শুনলে স্বামী আজানের জন্য মৌলভি ডেকে দিয়ে পরে লাড্ডু, নিমকপারা, বাকরখানি নিয়ে আসত। কিন্তু 'এই পর্যন্তই। একবার উঁকি দিয়ে দ্যাখেওনি বৌটা মরলো কি বাঁচলো।' বৃদ্ধ বয়সে যখন একসময় আতমন্নেসার শরীরের অভ্যন্তরে নানা রকম ভাঙচুর শুরু হয়, তখনো সে কাউকে বোঝাতে পারে না তার শরীরের অবস্থা। নিজের মেয়ের ভাষ্য :

> আম্মার শরীর মাশাল্লা খুব ভালো। আমরা কুনদিন আম্মার জ্বর ভি হইতে দেখি নাই।...না আম্মা, বিমার তোমার মনের মধ্যে। (পৃ-৪৯)

ওষুধের প্রতি আতমন্নেসার লোভ বহু দিনের। নিজের অসুস্থতার জন্য কিছুটা, আর সুন্দর-সুদৃশ্য ওষুধের লোভে কিছুটা, আতমন্নেসা নিজের অসুস্থ মেয়ের কিছু ওষুধ খেয়ে ফেললে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। তার ক্যানসার ধরা পড়ে। তারও অসুখ-বিসুখ হতে পারে, তার সত্যিই একটা বড় অসুখ হয়েছে—এ সত্যের স্বীকৃতিতে সে আনন্দিত হয়।

ইলিয়াস কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন আতমন্নেসার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে। আতমন্নেসার ছোটখাটো অসুস্থতা কখনো গুরুত্ব পায়নি বলে তার অভিমান প্রগাঢ়। হাঁপানি, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, পায়ে পানি ধরা, কলেরা, আমাশয় তাকে 'অচ্ছুত' মনে করেছে বলে তার দুঃখ কম নয়। কিন্তু অন্য অসুখ তো তার হয়েছে। এই মানসিক অবস্থান থেকে তার ভাবনা: 'শরীর লোহার হোক কাঠের হোক—রোগ ব্যারাম ছাড়া কি মানুষ বাঁচে?'

নিজে আজীবন বঞ্চিত হয়েছে বলে জীবনের জন্য কোনো শুভদৃষ্টি অর্জন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসুস্থতার নামে মেয়ে মতিবানুর বাপের বাড়িতে পড়ে থাকা, স্বামীর সোহাগ ইত্যাদি তার খারাপ লাগে। মতিবানুর বিপরীত স্বভাবের বোন নুরুন্নেসা যে বাপের বাড়িতে আসে না মতিবানুর মতো, তার সম্পর্কে আতমন্নেসা ভাবে: 'মানী মানুষের বিবি হলে কি মাকে ভুলে যেতে হবে?' আতমন্নেসার মনোবিকৃতির চূড়ান্ত অবস্থা স্পষ্ট হয় মেয়ে মতিবানুর স্বামী সম্পর্কে ভাবনায় :

জামাইটাই বা কিরকম পুরুষ মানুষ যে বিয়ের পর চার বছর বাচ্চা হয় না, এখনো অন্য বিয়ের নাম পর্যন্ত করে না।...রাগে আতমন্নেসার মুখ খারাপ করতে ইচ্ছে করে। (পৃ-৪৭)

স্বামী তাকে যে চড়-চটকানাটা দিয়েছিল বেঁচে থাকতে, তা সে ধরে না, স্বামীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ একটাই, 'মত্ত থাকতো খালি নিজের অসুখ নিয়ে।'

ক্যানসারের ভয়াবহতা সম্পর্কে আতমন্নেসা অবগত না হলেও রোগটা ফেলনা নয়, নানা ধরনের আয়োজন দেখে সে বুঝতে পারে। হাসপাতালে তার এক্স-রে করা, রক্ত নেওয়া ইত্যাদি ঘটনার কথা সে অন্যদের কাছে বর্ণনা করে 'মেলা-দেখে-আসা' কিশোরীর মতো। 'হিহি, কিসব ফিতাফুতা দিয়ে আমার বুক বান্দে, পিঠ বান্দে, হাত পাওয়ের ওংলি ভি বান্দে, কি করবো? না, আমার কলিজার মাপ লইবো। হিহি।' আনন্দে-উত্তেজনায় নিঃশ্বাস নিতে আতমন্নেসার রীতিমতো কষ্ট হয়। রোগের ভয়াবহতার ছায়া বাড়ির প্রাণচাঞ্চল্য নষ্ট করে দিলে আতমন্নেসা খুবই তৃপ্তি বোধ করে, যেন বাজি রেখে সে জিতে গেছে, আজীবন বঞ্চিত আতমন্নেসা অসুস্থতার মধ্যে জীবনের সফলতা খুঁজে পায়, নিজের প্রাক-সিদ্ধান্তের যাথার্থ্যে সে বারবার নিজের বিজয় ঘোষণা করে, 'আমি তগো আগেই কইছিলাম।'

আমাদের সমাজের একটা সাধারণ ঘটনাকে ইলিয়াস অসাধারণ করতে পেরেছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। একজন বঞ্চিত বৃদ্ধা কীভাবে ক্রমশ নিজস্ব পরিজনের প্রতি আস্থা হারান, আত্মজনের প্রতি হন বিরূপ; কীভাবে মনোবিকার তার পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং বিছানার পাশে সারি সারি ওষুধের মধ্যে কীভাবে সে শান্তি অন্বেষণ করে, নিজের অসুস্থতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে কীভাবে বিজয়ী হয়ে ওঠে—এ পর্যবেক্ষণ সমগ্র বাংলা গল্পে অভিনব।

আতমন্নেসার ছেলে, মেয়ে, বড় মেয়ের মৌলভি জামাই, পাড়ার ডাক্তার প্রমুখ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নানা উপ-প্রসঙ্গের বিস্তার 'অসুখ-বিসুখ' গল্পের গতিকে মাঝেমধ্যে ব্যাহত করে। যদিও, সেখানেও লেখকের তির্যক ভঙ্গি অব্যাহত থাকে। মনে মনে আতমন্নেসা নুরুন্নেসার স্বামীর স্বভাব ও তাদের খান্দানের প্রশংসা করে; কিন্তু তার ভাবনার মধ্য দিয়ে স্বামীটি যে মেয়ের বাপের বয়সী এবং মেয়ে যে তার তৃতীয় পক্ষ, এ তথ্য দিতে লেখক ভুলেন না। এতে আতমন্নেসার আত্মজা এই নারীও এ সমাজে ভাগ্যাহত—এ কথা স্পষ্ট হয়। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে কিছু টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইলিয়াস। আতমন্নেসাকে দেখতে আসা সুলতান ডাক্তার প্রসঙ্গে লেখক জানাচ্ছেন, সে ছিল ন্যাশনাল পাশ মন্মথ ডাক্তারের

কম্পাউন্ডার, মন্মথ ডাক্তার ইন্ডিয়া চলে গেলে সে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে বসেছে। আমরা জানলাম ভারত-বিভাগের অনেক পরও হিন্দুদের ভারতে চলে যাওয়ার বিষয়টি। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের এই ভারত যাওয়ার প্রসঙ্গ 'খোঁয়ারি', 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পেও আছে; ভারত থেকে মুসলমান চলে আসার প্রসঙ্গ আছে *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাসে। কিন্তু এ গল্পে এসব উপ-প্রসঙ্গ ও ম্যাসেজ কতটা অনিবার্য, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

'তারা বিবির মরদ পোলা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারাবিবিও 'অসুখ-বিসুখ'-এর বৃদ্ধা আমতন্নেসার মতো মনোবিকারগ্রস্ত। বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন তারাবিবির মনস্তত্ত্ব কখনো ইঙ্গিতে, কখনো স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। পুরান ঢাকার জীবন ও এখানকার পরিবারগুলোর অন্দরমহল নিয়ে লেখা ইলিয়াসের অন্যান্য গল্পের কতিপয় উপকরণ এ গল্পেও বর্তমান। তারাবিবির জীবনও শান্তি ও স্বস্তিহীন; এই অশান্ত জীবনে ঢুকে পড়েছে ছেলে ও ছেলে-বউয়ের প্রতি নানা রকম সন্দেহ। ছেলে গোলজার আল্লি, ছেলে-বউ সখিনা এবং অসুস্থ স্বামী রমজান আলি তার জীবনকে দুঃসহ করেছে, নিঃশেষ করেছে। ফলত সে নিজেও নানাভাবে দুঃসহতর করে তুলেছে এদের জীবন। ঘটনা যতটুকু না বাইরে ঘটে, তার চেয়ে বেশি ঘটে তার মনে; যাবতীয় ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করানোও তার স্বভাবের অন্তর্গত। মানুষ শিক্ষিত হোক বা না হোক, তার একটা নিজস্ব ভাবনার জগৎ, ভালো-মন্দের বোধ এবং প্রত্যাশা-প্রাপ্তির দ্বন্দ্বময় জগৎ থাকেই। তারাবিবিরও আছে। ইলিয়াস তারাবিবির জগৎকে বাইরে থেকে দেখেননি, দেখেছেন ভেতর থেকে। তারাবিবির জগৎ তার নিজের দিক থেকে উপস্থাপিত হয়েছে।

তারাবিবির সন্দেহ, তার ছেলে গোলজার পরনারীর সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে; এ সন্দেহ থেকে রাত-দিন খিস্তি করে ছেলের জীবন সে দুর্বিষহ করে তোলে। অথচ এসব সন্দেহের পেছনে কোনো জোরালো যুক্তি নেই, তা সে নিজেই বুঝতে পারে। কাজের মেয়ের সঙ্গে ছেলের অবৈধ সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেলে অবশেষে ছেলেকে তার যথার্থ 'মরদ পোলা' বলে মনে হয়। এবং তখনই ছেলের পক্ষ অবলম্বন করে সে স্বস্তি পায়, তৃপ্তি পায়।

তারাবিবির এই মনোবিকৃতির কারণ সরাসরি বিশ্লেষিত হয়নি, যে রকম হয়েছে আতমন্নেসার ('অসুখ-বিসুখ') ক্ষেত্রে। তবে দুটো বিষয় আমাদের নজরে আসে। ষাট বছর বয়সে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে ২৫ বছরের তারাবিবিকে বিয়ে করেছিল রমজান আলি। তারাবিবির জীবন যে সুখের হয়নি, তারাবিবির নিজের ছেলে গোলজারের স্মৃতিবর্ণনার মধ্যেই তা স্পষ্ট :

> গোলজারের একঘেয়ে জীবনের শৈশবের শেষভাগ, কৈশোরের পুরোটা, এমনকি যৌবন কালের প্রথম অংশ তো তারাবিবির কান্না দিয়েই বিরতিময় ছিলো। (পৃ-৬৭)

স্বামীর প্রতি তারাবিবির ক্ষোভের মধ্যেও রয়েছে তার অশান্ত জীবনের ছবি :

> তুমি তো একখানা মরা মানুষ। তামামটা জিন্দেগী ভইরা খালি বিছানার মইদ্যে পইড়া রইছো, একটা দিন বুঝবার পারলা না আমি ক্যামনে কি পেরেশানির মইদ্যে ঘরবাড়ি চালাই। (পৃ-৬২)

তারাবিবির যৌন-অতৃপ্তির কোনো প্রসঙ্গ গল্পে নেই। কিন্তু বিয়ের পর থেকে তারাবিবির কান্না, মরা মানুষের মতো নিষ্ক্রিয় পড়ে থাকা স্বামীর প্রতি ক্ষোভ এবং রমজান আলির প্রথম পক্ষের মেয়ের 'পঁচিশ বছরের ছেমড়িটারে লইয়া বুইড়ার বহুত মুসিবত'—এ রসিকতার মধ্যে তারাবিবির অতৃপ্ত জীবনের চেহারা ধরা পড়ে। এ জন্যই নিজের যুবক সন্তানের মধ্যে যথার্থ 'মরদ পোলা'র সাহস ও আচরণ সে প্রত্যাশা করে থাকবে। যথার্থ মরদ পোলার সাহস ও স্বভাবের কোনোটাই বস্তুতপক্ষে গোলজারের মধ্যে ছিল না। এসব সন্তানের মধ্যে দেখে সে স্বস্তি পেতে চেয়েছে। ছেলের মধ্যে যে স্বভাব সে প্রত্যাশা করে, তা জাগানোর জন্যই সে ছেলের বন্ধু আবুল হোসেনের স্ত্রী রাবেয়া ও স্কুলজীবনের সহপাঠী বিনয়ের বোন দীপালির সঙ্গে ছেলের শারীরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে নিরন্তর খিস্তি করে গেছে। মায়ের আচার-আচরণ ছেলে গোলজারের মধ্যে বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়; নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে বিয়ের আগে ভেবেছিল : 'বাপ হালায় বুইড়া হইয়া বিয়েটা না করতো তো জিন্দেগীতে দুনিয়ার মধ্যে পয়দাই হইতাম না।'

পৃথিবীতে না আসার সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে বলে বুড়ো বাপের মধ্যে সে যে অন্যায় খুঁজে পায়, তাতেও তার বিতৃষ্ণার প্রকাশ ঘটে। বিয়ের পর স্ত্রীর পাশে শুয়ে কোনো দিন জন্মগ্রহণ না করার আক্ষেপ অবশ্য আর থাকেনি। জীবনের সদর্থ ও ইতিবাচকতার প্রতি ইলিয়াসের এ চরিত্রের একবার আগ্রহ লক্ষ করা গেলেও[৬] শেষ পর্যন্ত তা আর অবশিষ্ট থাকেনি। তার চরিত্র সম্পর্কে পুত্রবধূর মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে তারাবিবি তার ভাবনাকে পুনরায় জীবনবিমুখ করে তোলে।

ঘরের কাজের মেয়ে ১০ টাকার জন্য স্বেচ্ছায় গোলজারের হাতে ধরা দিতে চাইলেও যে সাহসহীনতার জন্য তার 'ফাইটিঙের' ছবি দেখতে ভালো

লাগে, সেই সাহসহীনতার জন্যই গোলজার তাকে ভোগ করতে পারে না। বিনয়ের বোনের সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করেছে বলে তারাবিবি একদিন প্রশ্ন তুলেছিল, 'বেলা তিনটা পর্যন্ত বেজাত মাগীটার লগ বইয়া রইছস—আমার ঘরে ফেরেশতা আইব কুনদিন?' (পৃ-৭৪)[৭] মা-বৌয়ের অনুপস্থিতিতে ঘরে কাজের মেয়ে নিয়ে গোলজার দরজায় খিল দেয়—রমজান আলির মুখে এ অভিযোগ শুনে সেই তারাবিবিই বলে :

> 'পোলায় আমার জোয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইয়া গেলো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা কেমনে?' (পৃ-৮০)

—এখানে এসে সন্তানের কাছে তারাবিবির প্রত্যাশা পূর্ণতা পায়।

'অসুখ-বিসুখ'-এর আতমন্নেসা এবং তারাবিবি চরিত্রের নানা সাযুজ্য রয়েছে। দুজনের মনোবিকৃতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। মেয়ের সন্তান হয় না দেখে মেয়েজামাই পুনর্বার বিয়ে না করলে আতমন্নেসার মুখ খারাপ করতে ইচ্ছে করে। মেয়েজামাইয়ের এই আচরণ তার কাছে অসহ্য। আর তারাবিবি তৃপ্তি খোঁজে পরনারীর সঙ্গে নিজের সন্তানের অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে। দুজনেরই স্বামী অসুস্থ; অসুস্থ বলে স্বামীর বিরুদ্ধে রয়েছে দুজনেরই অভিযোগ—এই অসুস্থতাও তাদের চিন্তাকে ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত করেছে। দুজনেই ছেলে ও ছেলে-বউকে অপছন্দ করে, ছেলে খোরশেদ এবং বউ সিতারা সম্পর্কে আতমন্নেসা অকথ্য ভাবে, তারাবিবির তা আর ভাবনার মধ্যে থাকেনি, সে প্রকাশ্যেই উচ্চারণ করে। দুজনেই সন্দেহপ্রবণ, ভাবনায় অপরিণামদর্শী। গভীর ভাবনার অবকাশও তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এভাবে একজন বৃদ্ধা ও একজন প্রৌঢ়া—দুই নারী, যারা যুগপৎ স্ত্রী, মা ও শাশুড়ি—আজীবন বঞ্চনা ও অতৃপ্তির কারণে যারা পরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য করতে পারে না—তাদের মনোবিকৃতি ও সেই সঙ্গে পারিবারিক জীবন স্পষ্ট করে তুলেছেন লেখক।

'পিতৃবিয়োগ' গল্পটি পাঠককে সবচেয়ে বেশি সংশয়কাতর করে তোলে; কোনো যুক্তিতে এই সংশয় থেকে উত্তরণ সম্ভব না হলে বিষয়-প্রকৃতির দিক থেকে এ গল্পের সাফল্য এবং লেখকের জীবনোপলব্ধির স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটি : ১. পোস্টমাস্টার আশরাফ আলি, যার লাশের বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের সূচনা, ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্য দিয়ে যার জীবনকালের কথা জানা যায়; ২. আশরাফ আলির পুত্র ইয়াকুব। বিয়ের ১৮ মাস পর পুত্র ইয়াকুবের জন্মের সময় আশরাফ আলির স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ইয়াকুব মামার বাড়িতে থেকে পড়ালেখা করে, বদলির চাকরির সুবাদে

আশরাফ আলির জীবন কাটে বিভিন্ন জায়গায়। তিনি ছেলের জন্য নিয়মিত টাকা পাঠাতেন এবং পিঁপড়ের সারির মতো গুটি গুটি অক্ষরে বিভিন্ন উপদেশ-সংবলিত চিঠি লিখতেন। অধ্যবসায়ী, সৎ, নিজের সিদ্ধান্তে অটল আশরাফ আলির মধ্যে পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ কখনো দেখা যায়নি। ইয়াকুব পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে সদ্য যোগ দিয়েছে, এ সময় আশরাফ আলি মারা যান। খবর পেয়ে ইয়াকুব আসার পর, পাড়া-প্রতিবেশী ও আশরাফ আলির বন্ধুমহলের মুখে বিভিন্ন মন্তব্য ও নানা গল্প শুনে আশরাফ আলির যে চেহারা দাঁড়ায়, তার সঙ্গে ইয়াকুব তার বাবাকে মেলাতে পারে না। ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পিতার কুলখানির আগেই কর্মস্থলে ফিরে যায়; বলা যায় সে পালিয়ে যায়।

গল্পটির যুগপৎ আকর্ষণীয় ও বিভ্রান্তিকর দিক হলো দুই প্রকৃতির আশরাফ আলির উপস্থাপনা। ইলিয়াস সাধারণত ঘটনাকে দেখেন ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। ইয়াকুবের স্মৃতিবর্ণনায় আশরাফ আলির চরিত্র এবং তার সঙ্গে ঘটনাবলির যে বিবরণ রয়েছে, তাতে, ব্যক্তিজীবনে আশরাফ আলি একজন গম্ভীর, কর্তব্যসচেতন, মিতবাক, রাগী মানুষ ছিলেন বলে মনে হয়। মৃত্যুর পর স্থানীয় লোকজন তাঁর সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করে, তাতে মনে হয়, তিনি ছিলেন অমায়িক, সদালাপী, স্নেহবৎসল, মদ্যপায়ী, গল্পবাজ, হাস্যরসে সবাইকে মাতিয়ে রাখার মতো একজন মানুষ। পিতার এমন একটি বিরুদ্ধ প্রকৃতি ফুটে উঠলে ইয়াকুব যেমন মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি পাঠকও পতিত হয় বিভ্রান্তির মধ্যে।

আমরা লক্ষ করি, মামাবাড়িতে আশরাফ আলি একদিন শিশুপুত্র ইয়াকুবকে দেখতে এলে সে বাপের বুকে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে; আশরাফ আলি ছেলেকে মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেন :

> বয়স হলে ন্যাকামো শোভা পায় না। (পৃ-৮৬)

১২/১৩ বছর বয়সে মৃত মাকে স্বপ্ন দেখে ইয়াকুবের জ্বর এলে এ বিষয়ে পিতা আশরাফ আলির চিঠির বক্তব্য :

> তরল বিষয়ের প্রতি অবাঞ্ছিত মনোযোগ ও অহোরাত্র লঘু কল্পনার জগতে অনুচিত বিচরণই এইরূপ স্বপ্নদর্শনের কারণ। চিত্ত উচ্চস্তরের চিন্তা দ্বারা শক্তিশালী হইলে কলঙ্ক ঘটিবার সম্ভাবনা রহিত হয়। (পৃ-৮৬)

বালক বয়সে মাকে স্বপ্ন দেখা যার কাছে কলঙ্কজনক ঘটনা, তার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে পুত্রকে শুনতে হয় মদ্যপানের অভ্যাসের কথা। পোস্ট অফিসের পিয়ন গফুরের ভাষ্য তাৎপর্যপূর্ণ :

> শালার এহোসান ডাক্তারই মাস্টার সায়েবরে খেলো, বুইলেন? শালা পেত্যেক দিন নিজির দোকানে বসি ওঁয়ারে মৃতসঞ্জীবনী খাওয়াতো। বাঞ্চোৎ কিপ্টের একশেষ, নিজেও ওঁয়ার পয়সায় বোতল বোতল মাল গিলতো। মাস্টার সাহেবের বুকির ব্যথা হলো মাল খেতি খেতি। এই মাটির মানুষটারে শালা শেষ করি ফেললো। (পৃ-৯৩)

পেয়ার হাটে মুকুন্দ সাহার দোকানে মধ্যরাত অবধি আড্ডা মারা, জামগাছ থেকে পড়ে জখম হওয়া করিম গাজীর মেয়েকে 'ও মনি তুমি না খাও তো তোমার এই বুড়ো ছেলিটা না খেয়েই মরবে' বলে নিজের হাতে ভাত খাওয়ানো ইত্যাদি ঘটনা আমাদের একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়: পুত্রের স্মৃতিতে পিতার ভাবমূর্তি একেবারেই বিপরীত হয় কী করে?

ইলিয়াসের গল্পে চরিত্রের মনোবিপর্যয় বা অদ্ভুত-উদ্ভট আচরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় সরাসরি থাকে অথবা প্রচ্ছন্ন, আতমন্নেসা ('অসুখ-বিসুখ') ও তারাবিবির ('তারা বিবির মরদ পোলা') মনোবিকারের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনায় তা লক্ষ করা গেছে ইতোমধ্যে; কিন্তু এ গল্পে আশরাফ আলির দ্বৈতমূর্তির কোনো বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, আশরাফ আলির দ্বৈতমূর্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তার নিজের কোনো ভূমিকা নেই। একদিকে ইয়াকুবের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, অপরদিকে আশরাফ আলির বন্ধু-প্রতিবেশীরা মৃত্যুর পরে বিপরীত স্বভাবের দুই আশরাফ আলি সৃষ্টির জন্য দায়ী। সাধারণত মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়ে থাকে, মানুষের এ স্বভাব কতদূর যেতে পারে, সেটি দেখানো ইলিয়াসের উদ্দেশ্য—এমন মনে হতে পারে। বিশেষত, আশরাফ আলির লাশ দাফনের পর স্কুলের মাঠে বসে সবার আশরাফ আলি-চর্চা, করিম গাজীর বক্তাসুলভ ও সাব-রেজিস্ট্রারের সভাপতিসুলভ ভঙ্গি, বক্তব্যের মধ্যে সাধু-ক্রিয়াপদের ব্যবহার যে অবাস্তব ও হাস্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ইলিয়াস বাঙালির প্রাগুক্ত স্বভাবকে ব্যঙ্গ করছেন। কিন্তু আশরাফ আলি সম্পর্কে বন্ধু-প্রতিবেশীদের মন্তব্য এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা-বর্ণনাকে কেবল মৃত ব্যক্তির প্রশংসা-বর্ণন বলে মেনে নেওয়া যায় না। গফুর পিয়নের উদ্ধৃত সংলাপ থেকেই তা অনুমান করা চলে। সে পোস্টমাস্টার আশরাফ আলিকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত—এ জন্যই কৃপণ এহসান ডাক্তারের সঙ্গে বসে মদ খাওয়া তার পছন্দ হয়নি। এ কারণেই আশরাফ আলিকে কবর দেওয়ার অব্যবহিত পরই সে তার ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারে না। এভাবে আশরাফ আলির মদ্যপানের বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

ইয়াকুবের জন্মের সময়ে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে, স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত বলে আশরাফ আলি ছেলের সঙ্গে কখনো অন্তরঙ্গ আচরণ করতে পারেনি—এ ধরনের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত, কিন্তু ইয়াকুবের 'বড়ো খালার রিপোর্ট' অনুসারে শুরু থেকেই আশরাফ আলির টাইপটা এ রকম!—এ কথা জানার পর এ সিদ্ধান্তেও আর সন্তুষ্ট থাকা যায় না। কারণ, বিয়ের পরে হলেও শ্যালক-শ্যালিকার কাছে, আশরাফ আলির মৃত্যুর পর সবার বলা এই অন্তরঙ্গতার কিছুটা প্রকাশ পেত। শেষ পর্যন্ত আশরাফ আলি সম্পর্কে ইয়াকুব ও প্রতিবেশীদের অভিজ্ঞতা না মেলার বা আশরাফ আলির দ্বৈতপ্রকৃতির প্রচ্ছন্ন কোনো যৌক্তিক কারণও উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয় না।

তবে 'পিতৃবিয়োগ' গল্পে ইয়াকুব চরিত্রটি বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। এ চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখকের ভঙ্গি ও যুক্তি বরাবরের মতো ক্রিয়াশীল। আজীবন পিতার অমনোযোগ এবং পিতার মৃত্যুর পর পিতা সম্পর্কে লোকজনের মন্তব্য তার মনোবিকার ঘটায়। বাবার প্রতি তার মধ্যে প্রচণ্ড রাগ জন্মে; সে ভাবে, এখানে ইলিয়াসের ভঙ্গি লক্ষণীয়:

> না জীবনে, না মরণে—লোকটা কোনো দিনই তাকে পাত্তা দিলো না। ওদিকে দ্যাখো এহসান ডাক্তারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বোতল ওড়ায়। (পৃ-৯৪)

বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য শুনে সে বাবাকে 'জুৎ করে' কোথাও বসাতে পারে না। ফলে সে কেবল চারদিকে বাবার হাসির শব্দ শোনে এবং গম্ভীর বাবা পরিণত হয় নানা মানুষে, এদের কোনোটাকে প্রকৃত বাবা হিসেবে শনাক্ত করতে না পারার মধ্য দিয়ে তার সমাধানহীন বিভ্রান্তি প্রকট হয়। লাশ দাফনের পরদিনই কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য অপরিচিত রাস্তা ধরে সে একাকী যাত্রা করে। প্রকৃতপক্ষে সবার মন্তব্য ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার বাবার যে অচেনা-অপরিচিত মূর্তি নির্মিত হয়, তাকে অতিক্রম করার জন্যই সে পালিয়ে যায়। তার এই পলায়নের আরও একটি কারণ হলো মানসিক শক্তির অভাব। আশরাফ আলির 'মাজা' সোজা এবং পায়ের পাতায় জোর থাকলেও তার সন্তান ইয়াকুবের মধ্যে এর কোনোটাই ছিল না। মানসিকভাবে সে শক্তিশালী হতে পারেনি। আনোয়ার আলি ('উৎসব': *অন্য ঘরে অন্য স্বর*) ও ওসমান গনির ('প্রতিশোধ': ঐ) মতো ইয়াকুবও মানসিক শক্তিরহিত, অক্ষম, অসমর্থ। আনোয়ার আলি বন্ধুর স্ত্রীকে বলার জন্য নিরীহ-সাজানো বাক্য উচ্চারণ করতে পারে না, বোন হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওসমান গনি নিজেই প্ররোচিত হয় আত্মহত্যায়, (যদিও আত্মহত্যার সাহসও তার নেই)

ইয়াকুবও ক্ষীয়মাণ নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকের প্রতিনিধি, মামাকে তার বলতে ইচ্ছে করে—'সারাটা জীবন আব্বা একা থাকলো, আব্বার জন্য কিছু করতে পারলাম না।' মৃত আশরাফ আলির ভয়েই সে এই পুত্রজনোচিত সংলাপ শেষ পর্যন্ত মামার উদ্দেশে উচ্চারণ করতে পারেনি। কারণ, পিতার কাফন পরা লাশ লোবান-ধুপের গন্ধের তর্জনী তুলে আদিখ্যেতা দেখাতে বারণ করে। ফলে পালানো ছাড়া তার উপায় থাকে না, সীমা থাকে না তার বেদনা ও ব্যর্থতার।

বিভিন্ন ধরনের মানুষ এবং মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতিকে ইলিয়াস উন্মোচন করেছেন নানা গল্পে। মাতৃহীন, পিতার স্নেহ, ভালোবাসা-বঞ্চিত এক পুত্রের বিভ্রান্তির অভিজ্ঞতাও আমাদের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে।

তথ্য-সংকেত

১. চারটি গল্প নিয়ে *খোঁয়ারি* যদিও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮২ সালে, কিন্তু এর প্রথম দুটি গল্প: 'খোয়ারি' ও 'অসুখ-বিসুখ' লেখা হয়েছে *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬) প্রকাশের এক বছর আগে (১৯৭৫)। উল্লেখ্য, অন্য গল্প দুটি, 'তারা বিবির মরদ পোলা' ও 'পিতৃবিয়োগ' লেখা হয়েছে যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৭৯ সালে। *খোঁয়ারির* দ্বিতীয় মুদ্রণে এর গল্পগুলোর রচনাকাল মুদ্রিত হয়েছে।

২. জাফর মদ খেতে খেতে যুদ্ধে হাফ ডজন পাঞ্জাবি সেনা মারার প্রসঙ্গ গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করার পর ফারুকের ভাবনা: 'জাফরের গালে গোটা দুয়েক চড় দিতে পারলে এখন সুখ পাওয়া যায়। শুয়োরের বাচ্চা! খুব ফ্রন্টের গরম দ্যাখাস্, তোর বাপ মানিক ভাই ফ্রন্টে গেছে কখনো?' (পৃ-১৭)।

৩. 'প্রতিশোধ': *অন্য ঘরে অন্য স্বর*।

৪. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: *বিদায়, অবন্তী!*, ১৯৯৫ ঢাকা, পৃ-১২।

৫. *খোঁয়ারি* গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প।

৬. এ পর্যন্ত জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহশীল, জীবনের জন্য যথার্থ সংগ্রামশীল কোনো মানুষের অস্তিত্ব ইলিয়াসের গল্পে পাওয়া যায়নি। এসব লক্ষ করা যাবে তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *দুধভাতে উৎপাত*-এ (১৯৮৫), সেখানে ইলিয়াস গ্রামের দিকে চোখ ফেরাবেন।

৭. লক্ষ করার বিষয় হলো, তারাবিবির আগ্রহেই বিনয়ের বোন ঘণ্টা খানেক গোলজারের ঘরে বসেছিল। চা বানানোর নাম করে সরে পড়েছিল তারাবিবি।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুধভাতে উৎপাত

সমাজ-রাজনীতির ক্ষয়, মানুষের অসুস্থতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে ঘুরেফিরে এসেছে। *দুধভাতে উৎপাত*[১] গল্পগ্রন্থে ইলিয়াস সমাজ ও রাজনীতির আরও কাছাকাছি চলে আসেন। চলে আসেন গ্রামে, বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে—যেখানে আবহমানকাল থেকে নিরন্ন মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে; অব্যাহত রয়েছে ওপরতলার শোষণ। এ গ্রন্থের 'দুধভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল' ও 'দখল' গল্পে গ্রামের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। গ্রামের ক্ষুধাপীড়িত নিঃস্ব মানুষ, ভূমি-ব্যবস্থা, গ্রামের মানুষের সংঘবদ্ধতা, শ্রেণীচেতনা ও প্রতিরোধস্পৃহা এ গ্রন্থে নতুন মাত্রা পায়। আগের দুটি গ্রন্থে[২] ইলিয়াসের মানচিত্র এতটা বড় ছিল না, পরস্পর-সম্পর্কিত মানুষের জন্য মানুষের চিন্তা, সংঘবদ্ধতা, স্নেহবাৎসল্য ছিল প্রায় অনুপস্থিত। এ গ্রন্থে সেসব যুক্ত হতে শুরু করে। 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে বিচ্ছিন্নতার বোধ ক্রিয়াশীল থাকলেও অন্য ৩টি গল্পে বিচ্ছিন্নতার বিপ্রতীপে শ্রেণীগত দিক থেকে পরস্পরের একধরনের ঐক্যচিন্তা লেখকের গতিশীল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও গভীর জীবনোপলব্ধির প্রতিফলন ঘটায়।

পুরান ঢাকার একটি পরিবার এবং পরিবারটি যে পাড়ায় অবস্থিত, সে পাড়ায় 'মিলির হাতে স্টেনগান' আবর্তিত হলেও ইঙ্গিতে-প্রতীকে গল্পটি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। এই প্রতিচ্ছবি 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*), 'খোঁয়ারি' (*খোঁয়ারি*) গল্পেও আছে, কিন্তু এ গল্পে যুক্ত হয়েছে প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে পুনরায় যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা, দুঃসময়েও ভাইয়ের প্রতি বোনের স্নেহ-ভালোবাসা।

মিলির বড় ভাই রানা যুদ্ধ করেছে '৭১-এ, কিন্তু অস্ত্র জমা দেয়নি, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে এখন সে ঘরে দামি জিনিসের স্তূপ ঘটায়। মুক্তিযুদ্ধের ২ বছর[৩] আগে পাড়ার আব্বাস মাস্টারের মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছিল, যুদ্ধ থেকে ফেরার পর স্বাধীন দেশে সে পুরো পাগল হয়ে যায়। আকাশে সে কেবল শত্রু দেখে, শত্রু নিধনের জন্য সে একটা স্টেনগান খোঁজে। মিলি তাকে দিয়ে প্রভাবিত হয়। আব্বাস হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর মিলি তার ভাইয়ের স্টেনগান আব্বাস পাগলার হাতে তুলে দিতে চায়। আব্বাস তখন সুস্থ হয়ে গেছে, 'মিলি আমি না ভালো হইয়া গেছি। তুমি বোঝো না? আমার ব্যারাম ভালো হইয়া গেছে। *(দুধভাতে উৎপাত*: দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ-২৩) মিলি নিজেই অতঃপর আব্বাস পাগলা হয়ে ওঠে। তার চোখে সুস্থ আব্বাস পাগলা তখন আর দশজন মানুষের মতোই সাধারণ ও সম্ভাবনাহীন।

রানা ও তার বন্ধুদের হঠকারী চরিত্রের বিপরীতে প্রথমে আব্বাস পাগলা ও পরে মিলি নতুনতর সংগ্রামস্পৃহার প্রতীক। রানা ও তার বন্ধুরা, 'প্রতিশোধ' গল্পের আনিস, 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-এর দুজন চাঁদা আদায়কারী, 'খোঁয়ারি' গল্পের ফারুক-জাফরের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত তফাত নেই। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এরা রাজনীতির নামে চাঁদা আদায় করে ('অন্য ঘরে অন্য স্বর'), অন্যের দোকান কেড়ে নেয় ('প্রতিশোধ'), পার্টির নামে নিজেদের একসময়কার রাজনৈতিক সতীর্থের (হিন্দু, তাই দুর্বল) বাড়ি দখলের ন্যক্কারজনক পাঁয়তারা চালায় ('খোঁয়ারি') এবং হাইজ্যাক করে ('মিলির হাতে স্টেনগান')। দল ক্ষমতায় রয়েছে এবং তারা সমবেতভাবে নানা সুবিধা আদায় করছে, কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। একেকজনের একেক ক্ষমতা বলে রানা কাউকে বিশ্বাস করে না; সংগত কারণেই সে কারও দিকে পক্ষপাত দেখাতে পারে না, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ তাদের অস্থিরতা ও সময়কে নগ্নভাবে তুলে ধরে। আবার আব্বাস পাগলার ধারণা, তারা আব্বাসের কাছ থেকে ইনফরমেশন বের করে তাকে এনিমি ফ্রন্টে পাঠাতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের পর তার মাথার ভেতর যে নতুন যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে সে একসময়ের যোদ্ধা রানাদের শত্রু হিসেবে শনাক্ত করেছে সংগত কারণে। এই প্রতীক চরিত্রের শনাক্তকরণের মাধ্যমে লেখক স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রকৃত শত্রুদের চিহ্নিত করেছেন। এই শত্রুরা পাগল আব্বাসকে ভয় ও সন্দেহ করে, কারণ, কার ভেতরে কী পাওয়ার আছে, কে বলতে পারে?

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ঢুকে পড়ে সন্দেহ, জীবন কাটে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার মধ্যে। মিলির বাবার কাছে আব্বাস গোয়েন্দা

সংস্থার লোক। 'রানাকে তো আজকাল সবাই চেনেটেনে, মানে পপুলার তো'—তাই পাগল সেজে আব্বাস তার ওপর নজর রাখছে বলে তার ধারণা। কিন্তু রানার মতো পাওয়ারফুল ছেলেও এই পরিবারের অনিশ্চয়তা দূর করতে পারে না। এভাবে আমরা দেখি, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে নগরের মানুষ অবরুদ্ধ। তারা রুদ্ধশ্বাসে দিন কাটায়। রাত জেগে সন্তানের জন্য প্রতীক্ষা ও দুশ্চিন্তা করেন মা। ব্যাংকে ডাকাতি হয়, সমস্ত রাত বাসার অদূরে রাস্তায় গোলাগুলি চলে। ঘরে ঘরে তৈরি হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন ভয়াল রাত্রির মতো অসহ্য উৎকণ্ঠা ও স্তব্ধতা। গোলাগুলির সময় রানাদের ঘরে সবাই শুয়ে পড়ে মেঝেয়। রাত্রি জাগরণের পর সকালে স্টেনগান হাতে রানাকে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে মিলি :

> যুদ্ধের সময় এই জিনিষটি (স্টেনগান) নিয়ে ভাইয়া কতো কথা বলতো। আর এটা এখন কোথায় রাখে, কখন লুকিয়ে নিয়ে বেরোয় কিছু জানা যায় না। ভাইয়াটা কি হয়ে যাচ্ছে, কতদিন চুল কাটে না! মিলি কি রানাকে জাগিয়ে দেবে? থাক, বেচারা আরেকটু ঘুমিয়ে নিক। (পৃ-২২)

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাঙালির স্বপ্ন ও গর্ব বাস্তবায়িত হয়নি। সুস্থ রাজনৈতিক পন্থা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়নি, যুবসমাজ হয়েছে অবক্ষয়ের শিকার। যে অস্ত্র একদিন দেশ ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল, সে অস্ত্রই বিপন্ন করেছে দেশ ও মানুষের অস্তিত্ব। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', 'খোঁয়ারি' গল্পে চাঁদা আদায়কারী কিংবা ফারুক-জাফর আমাদের সহানুভূতি আদায় করে না; কিন্তু এ গল্পে মিলির স্মৃতিবর্ণনা, এদের নিজেদেরই সীমাহীন অনিশ্চয়তা আমাদের সহানুভূতি আদায় করে নেয়। এভাবে মিলি, তার ভাবনা-অনুচিন্তন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, ভাইয়ের প্রতি তার স্নেহ-ভালোবাসা ও মানবিক দুশ্চিন্তা নতুন সংযোজন হয়ে ওঠে। এদিকে, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস ও বিরাজমান স্বার্থপরতার ভেতর আব্বাস পাগলাকে মিলির ব্যতিক্রম মনে হয়েছিল, সে এই অবস্থার অবসান চেয়েছে বলেই আব্বাসের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চেয়েছে। কিন্তু সুস্থ আব্বাস পাগলা তখন ইন্ডেন্টিং ফার্মে ঢুকে পড়তে ব্যস্ত। মিলি তখন নিজেই আব্বাস পাগলায় রূপান্তরিত হয়, আকাশে যুদ্ধদৃশ্য দেখে :

> চাঁদ তাহলে এতক্ষণে শত্রুর কব্জায় চলে গেছে। দখলদার সেনাবাহিনীর একনাগাড় বোমাবাজিতে চাঁদের হালকা মাটির ধুলা এবং বারুদের কণা নিচে ঝরে পড়েছে। (পৃ-২৪)

তখন নিজেই যুদ্ধের জন্য স্টেনগান হাতে একটা উড়াল দেওয়ার জন্য মিলি পা ঝাপটায়। মূলত আব্বাস পাগলা ও মিলি মুক্তি-আকাঙ্ক্ষী মানুষের

প্রতীক। চাঁদ তাদের স্বপ্ন। আব্বাস চাঁদের চতুর্দিকে শত্রু দেখলেও তার চাঁদে আঘাত লাগেনি, সে সুস্থ হয়ে ওঠার পর মিলি বোমার আঘাতে চাঁদের মাটি ঝরে পড়তে দেখে। চাঁদরূপ স্বপ্নকে আহত হতে দেখে মিলি যখন ওড়াল দেওয়ার জন্য পা ঝাপটায়, তখন বাংলাদেশই স্বপ্নের হননে গোঙায়, পা ঝাপটায়।

মিলির একটি স্বপ্নের সঙ্গে 'প্রতিশোধ' (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*) গল্পের ওসমান গনির দেখা একটি স্বপ্নের সাদৃশ্য রয়েছে। স্বপ্নে দুজনেই একটি ক্রেন বেয়ে উঠতে থাকে। ওসমান একা, মিলির স্বপ্নে থাকে আব্বাস। তবে দুজনের কেউই শেষ পর্যন্ত ক্রেনের (বা অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষার) চূড়ায় উঠতে পারে না, পা ফসকে পড়ে যায় গভীর খাদে। এই স্বপ্ন তাদের আকাঙ্ক্ষাকে যেমন তুলে ধরে, তেমনি তাদের ব্যর্থতাকেও স্পষ্ট করে। তাদের সাফল্যে কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অনুপস্থিত। তবু ওসমানের চেয়ে মিলি অগ্রসর ও সাহসী। ওসমান বাস্তবে কিছুই করতে পারে না, কিন্তু মিলি ঘরের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে হাসপাতালে আব্বাস পাগলাকে দেখতে যায়, তার হাতে স্টেনগান তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সে নির্দ্বন্দ্ব। এটা সম্ভব হয়েছে লেখকের জীবনোপলব্ধির রূপান্তরের কারণে। 'প্রতিশোধ' গল্পে স্বপ্নের সঙ্গে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়নি, তাই ওসমান অসহায় মধ্যবিত্তের ব্যর্থতার প্রতীকই থেকে গেছে। কিন্তু 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে মিলি শুধু ব্যর্থতার নয়, ওই আহত, অসহায় মানুষের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার প্রতীকে রূপান্তরিত।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যবস্থায় ক্ষুধাপীড়িত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষের আর্তনাদ 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পটি। এর সঙ্গে জড়িত হয় গ্রামের সুবিধাবাদী ও ক্ষুধাপীড়িত মানুষের নীচতা, ধর্মীয় সংস্কার ও তজ্জাত অহংকার। ধলেশ্বরীর তীরের অহিদুল্লা নামের এক কিশোরের চোখ দিয়ে গল্পের ঘটনাগুলোকে দেখা হয়েছে। দুদিন ধরে অসুস্থ অহিদুল্লার চার ভাইবোন, অসুস্থ মা জয়নাব বিবিসহ ছয়জনের একটি পরিবারের প্রত্যেককে নানা ভঙ্গিতে দেখান লেখক; পরিবারের মর্মন্তুদ অবস্থার ভেতর দিয়ে উন্মোচন করেন বাংলাদেশের গ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চেহারা।

'যেখানে তিন দিন বৃষ্টি হলো তো ডাঙা নদীর কোনো ভেদচিহ্ন রইলো না, সেখানে মানুষ বাস করে?' এই আক্ষেপ অহিদুল্লার বাবা মৌলবি কসিমুদ্দিনের। এখানে মৌলবির দাম বোঝার মতো লোক নেই বলে এবং প্রাকৃতিক অব্যবস্থার কারণেও সে চলে যায় তিস্তাতীরের খোলামহাটি গ্রামে নিজের দাম বাড়াতে। কিন্তু সেখানেও তার মূল্যবৃদ্ধির কোনো কারণ ঘটে না;

কোরবানির ঈদের পর মাংস-কলিজা নিয়ে একবার এবং বছরে আর দু-একবার ছাড়া এখানে তাকে দেখা যায় না। আসলে ৫টি সন্তান উৎপাদন ছাড়া এই পরিবারের সীমাহীন দুর্দশা ঘুচানোর ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা দেখা যায় না।

গ্রামের মানুষকে নিরন্তর তাড়িয়ে বেড়ায় ক্ষুধা, জয়নাব বিবি ও তার সন্তানদের ক্ষুধার কথা বলতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, ক্ষুধা গ্রামের দরিদ্র মানুষদের কতটা স্বার্থপর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করতে পারে। মৃত্যুপথযাত্রী জয়নাব বিবির হঠাৎ ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুধভাত খেতে ইচ্ছে করলে সন্তান অহিদুল্লা ভাবে, 'গোরু যখন ছিলো তখন কি এই মা মাগী ওদের দুধভাত দিতো?' তখন যে দুধের টাকায় হারুন মৃধার দোকান থেকে চাল আসত, ছেলে তা মনে রাখে না। তবে কসিমুদ্দিন বাড়ি এলে বছরে একবার দেড় পোয়া দুধ দিয়ে দেড় সের চালের ভাত রান্না করে ছয়জন খেত। চালের দাম বাকি পড়েছিল বলে আস্ত গরুই চলে যায় হাশমত মুহুরির কাছে, মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য সেখান থেকে দুধ আনতে গেলে শুনতে হয়, 'দুধভাত খাইলে তোর মায়ে ফাল পাইরা উঠবো, না?'

জয়নাব বিবি মরে যাচ্ছে, এ ঘটনা হাশমত মুহুরির বউ, মেয়ের জামাই হারুন মৃধা বা শহুরে ছেলেকে স্পর্শ করে না স্বাভাবিকভাবেই। এদের শ্রেণীগত অবস্থান পৃথক। কিন্তু আমরা থমকে দাঁড়াই, যখন দেখি, এতে তার সন্তানেরাও বিচলিত হচ্ছে না। কোরবানির সময় বাবার আনা গোশত প্রসঙ্গে এ সময় অহিদুল্লা ভাবতে পারে, 'মা হাজার হলেও আস্ত মেয়েমানুষ, ডেকচি ভরা গোশত দেখলে হুশ থাকে না।' ঘরের ভেতর মায়ের আহাজারি চলে আর মেয়ে খাদিজা কচুর ঝোপে পালিয়ে শসা খেয়ে ক্ষুধা তাড়ায়। জয়নাব বিবির ইচ্ছা পূরণের জন্য তার বড় জা হামিদা বিবি চালের গুঁড়া জ্বাল দিয়ে দুধভাতের মতো মেখে নিয়ে এলে ওই সানকি চার সন্তানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বর্ণনাটি তাৎপর্যপূর্ণ :

> মায়ের পদসেবা ছেড়ে হাজেরা এসে দাঁড়িয়েছে হামিদা বিবির হাতের সানকির ধার ঘেঁষে। খাদিজা তার শশা সম্পূর্ণ খেয়ে বা অভুক্ত অংশটি কোনো ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে রেখে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আহমদুল্লা'র মুখ থেকে অর্থহীন ধ্বনি ও লালা গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু খাদিজার হাঁটুর পেছনে ছেঁড়া পায়জামা'র ঝুলে-পড়া কাপড় ধরে সেও মুখ তুলে গোল ও কালো সানকিটা দেখছে।...এক চোখ কানা হলেও এবং মায়ের উল্টো দিকে থাকা সত্ত্বেও কানা রহমতউল্লা তার ভালো চোখটা দিয়ে সব দেখে ফেলেছে, সেও মায়ের কাছাকাছি বিছানার ওপর উঠে বসার চেষ্টা করছিলো। (পৃ-৩১-৩২)

—এই লোভ, এই স্বার্থপরতা ক্ষুধাজাত; ভাতের গন্ধ এদের পেটের আয়তন দ্বিগুণ করে। মায়ের প্রায় নিষ্কম্প হাতের তুলে দেওয়া ভাতের গ্রাস বসন্তের দাগ ভরা মুখে হাজেরা খেয়ে ফেললে অহিদুল্লা ভাবে, 'বেতমিজ আওরৎ! মেয়েমানুষের বুদ্ধি মানে ইবলিসের উস্কানি।' এখানে ভাইবোনের পরস্পরের প্রতি আলাদা কোনো স্নেহ-মমতা ভালোবাসার উপস্থিতি নেই। এরা চেনে ভাত; দুধভাত আর চালের গুঁড়া মেশানো ভাতের পার্থক্য এরা বোঝে না। 'পোলাপানরে তুমি কী খাওয়াইলা?' জয়নাব বিবির এ প্রশ্নের উত্তরে হামিদা বিবি যখন বলে, 'ক্যান বৌ? চাইলের গুঁড়ি পোলাপানরে কুনদিন খাওয়াস নাই? দুধ দিস কয়দিন? দুধের স্বাদ তর পোলাপানে জানে কি?' তখন বুঝতে পারি, কেন এদের জীবনে নানা সম্পর্কের ভেতর 'ভাত'ই মুখ্য। বিছানার প্রান্তে পড়ে যাওয়া 'দুধভাত' মাখা হাত 'স্তনের মতো' যখন খাদিজা চুষতে থাকে, তখন তাকে আর মানুষ বলেই চেনা যায় না। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষুধার কথা নানাভাবে এসেছে বাংলা সাহিত্যে,[৪] কিন্তু নিরন্ন মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার এ রকম প্রতিক্রিয়া বাংলা সাহিত্যের পাঠক এর আগে তেমন লক্ষ করেনি।

জয়নাব বিবির বমির কাছে পড়ে থাকা সানকির ওপর একঝাঁক পশুর মতো পাঁচটি ছেলেমেয়ে হুমড়ি খেয়ে যে দৃশ্যের সৃষ্টি করে, তা আমাদের কাছে ভয়ংকর-অসহ্য-অস্বাভাবিক ঠেকে। এতটা যেন হয় না, এ যেন অভিজ্ঞতার বাইরে বা অবাস্তব। আমরা যা কিছুকে 'মানবিক' বলতে শিখেছি, তার কিছুই এদের জীবনে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এরা যে পরস্পর ভাইবোন, লেখক উল্লেখ না করলে তা শনাক্ত করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত। মানুষের ক্ষুধা এবং ক্ষুধার্ত মানুষের চরিত্রের গতিপ্রকৃতির নগ্ন রূপ আরও নগ্ন ও বীভৎসরূপে উপস্থাপন করানোর জন্যই যেন ইলিয়াস সংকল্পবদ্ধ হয়ে ব্যাপারটিকে এমন ভয়ংকর ও অস্বস্তিকর করে তুলেছেন। কিন্তু অভিনিবেশ নিয়োগ করলে এই অস্বস্তির কারণ স্পষ্ট হতে থাকে। আসলে ক্ষুধা ও ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে ধারণা থাকলেও বাংলাদেশের গ্রামসমাজে বঞ্চিত মানুষের প্রকৃত অবস্থা যেমন আমরা জানি না, তেমনি এ অবস্থায় মানুষ কতটা বিচিত্র ও মানবেতর আচরণ করতে পারে—তা-ও আমাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতার বাইরে। ফলত, এ ধরনের ভয়ানক দৃশ্যের মুখোমুখি হলে একটু অস্বস্তি বোধ না করে পারা যায় না। এ রকম নির্মোহ পর্যবেক্ষণ ও নির্মম উপস্থাপন ইলিয়াসের স্বেচ্ছাকৃত। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তিনি দর্শকমাত্র, অংশগ্রহণকারী নন। কিন্তু যাদের তিনি দেখাচ্ছেন, তাদের বিস্ময়ে-বেদনায়-অস্বস্তিতে হতবাক হতে হবে।

প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনের কি কোনো সম্ভাবনা অবশিষ্ট নেই? 'মানুষের' কোনো প্রবণতাই কি আর উপস্থিত নেই তাদের মধ্যে? এর উত্তর অবশ্যই ইলিয়াসের জীবনোপলব্ধির গভীরে সন্ধান করা যাবে। জয়নাব বিবিদের যে এক টুকরো ব্যর্থ অহংকারের সুযোগ থেকে যায়, তা লেখক জানিয়ে দেন কৌশলে। দুদিন অভুক্ত থাকার পরও জয়নাব বিবি নিজেদের সম্মানের প্রশ্নটি ভোলে না বলে অহিদুল্লাকে বলে, 'মৌলবি মাইনষের পোলা তুই পাট কাটবি ক্যান?' চালের টাকা শোধ করতে পারে না বলে সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে গরুটাও যায়, তবু সে সম্মান ও গাইয়ের কথা ভোলে না। মরতে মরতে অহিদুল্লাকে বলে, 'বুইড়া মরদটা! কী দ্যাহস? গোরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী দ্যাহস।' জয়নাব বিবির মৃত্যুমুহূর্তে লেখকের সমাপ্তিবাক্য তাৎপর্যপূর্ণ :

> এত বমির পর নির্ভার মায়ের মুখের যে কঠিন চেহারা হয়েছে তাতে তার হুকুম তামিল না করে ওহিদুল্লার কি রেহাই আছে? (পৃ-৩৪)।

এই ইঙ্গিতপূর্ণ সমাপ্তিতে আমরা বুঝতে পারি, বমির ভেতর দিয়ে সমগ্র জীবনকে উগরে দিয়ে জয়নাব বিবি মারা যায় বটে, কিন্তু সে প্রবল শত্রু হিসেবে শনাক্ত করে যায় হাসমত মুহুরি, তার মেয়েজামাই হারুন মৃধা ও তার ছেলে ঢ্যাঙা আশরাফকে। গ্রামের এসব বিত্তবান মানুষ (জোতদারদের সমকক্ষ) সামান্য অর্থের বিনিময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ছিনিয়ে নেয়; তাদের নিঃস্ব করে টাকার পাহাড় গড়ে। এদের বিরুদ্ধে জয়নাব বিবির মৃত্যুকালীন বাক্যটিকে লেখক সমস্ত জনতার উদ্দেশ্যই ছুড়ে দেন।[৫]

এভাবে পুরো গল্পের পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানবেতর জীবনযাপনকারী মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ-সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে লেখক কেবল এই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়েছেন; লোভ-স্বার্থপরতার পাশাপাশি গ্রামে নিজস্ব শ্রেণীর মধ্যে যে সম্প্রীতি সূক্ষ্মভাবে এখনো টিকে আছে, তাকে অস্বীকার করার ফলে লেখকের চরম নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মূর্ত হয়। তিনি মূলত চিহ্নিত করতে চেয়েছেন মানুষের বঞ্চনার কারণ; গ্রামে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের নানা রকম খেলায় খুব ছোটদের নেওয়া হয় 'দুধভাত' হিসেবে, তাদের প্রকৃতপক্ষে খেলার সঙ্গী হিসেবে গণ্য করা হয় না, অর্থাৎ তারা খেলার আসল সঙ্গী না; এখানেও দুধভাত প্রকৃতপক্ষে দুধভাত নয়। অন্যদিকে 'দুধভাতে'র সানকির ওপর পাঁচজন অভুক্ত সন্তানের 'উৎপাত'ও আসল ঘটনা নয়, যুগযুগব্যাপী শোষণ-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জয়নাব বিবিদের ওপর যে উৎপাত চলে, সেটিই এই গল্পের প্রকৃত প্রসঙ্গ। জীবনকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন বলে ইলিয়াস

উৎপাতকারীদের শনাক্ত করতে পারেন সহজে—এই উৎপাত এবং তার বিপরীতে নিপীড়িত মানুষের ভূমিকা পরবর্তী গল্পগুলোতে স্পষ্ট হতে থাকবে।

দুধভাতে উৎপাত গল্পগ্রন্থে যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংগ্রামশীল জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন ইলিয়াস, তার নাগরিক অধ্যায় ধরা পড়েছে 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে। নগরের বাইরে যে বিস্তীর্ণ জনপদ-গ্রামাঞ্চল রয়ে গেছে, সে অধ্যায় ধরা পড়েছে 'দুধভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল', 'দখল' গল্পে।[৬] 'পায়ের নিচে জল' গল্পে পিতৃপুরুষের জমি বিক্রয় করতে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আতিকের চোখ দিয়ে লেখক দেখেছেন যমুনার ভাঙনপীড়িত উদ্বাস্তু কিষাণদের একটি গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের। দীর্ঘদিনের বর্গাচাষা কিসমত আলির কাছ থেকে জমি নিয়ে বিক্রয় করতে এসেছে আতিক, রাজধানীর অভিজাত এলাকা ধানমন্ডি-গুলশানে বাড়ি করতে, হার্ভার্ডে মেজো ভাইকে ইকোনমিক্স পড়াতে।

উন্নয়নশীল এই দেশে উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার মধ্যে যে একটা বড় কারচুপি রয়ে গেছে, লেখক তা স্পষ্ট করেছেন। গ্রামের বেশির ভাগ জমির মালিক শহরের বাসিন্দা। উৎপাদনের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত, উৎপন্ন ফসল থেকে তারা প্রায় বঞ্চিত। আবার সেসব জমি গ্রাম্য জোতদার-টাউটদের (আলতাফ মৌলবি) কাছে বিক্রি করার ফলে একদিকে বর্গাচাষি ও কৃষকেরা নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষের থলে হাতে নিতে বাধ্য হচ্ছে, অন্যদিকে শোষণকে স্থায়ী করার জন্য শক্ত হচ্ছে জোতদারদের ভিত্তি।

'দুধভাতে উৎপাত' গল্পের হাসমত মুহুরি, মেয়েজামাই হারুন মৃধার সঙ্গে এ গল্পের আলতাফ মৌলবির পার্থক্য নেই। অভাবের সময় হাসমত মুহুরি চাল দেয়, পরে সুযোগ বুঝে নিয়ে আসে শেষ সম্বল দুধেল গাই। দুর্ভিক্ষের সময় কয়েক মণ ধান দিয়ে কিসমত আলির ছয় আনি জমি রেজিস্ট্রি করে নেয় আলতাফ মৌলবি। অভুক্ত-মৃত্যুপথযাত্রী জয়নাব বিবির দুধভাত খাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনে হারুন মৃধা বলেছিল, 'তর মায়ের প্যাট খারাপ, তগো হইছে মাথা খারাপ।' আর যে লোক দুর্ভিক্ষের দিনে কয়েক মণ ধান দিয়ে কৃষকদের ভূমিহীন করেছে, তারা যমুনার তীরে ওয়াপদার বাঁধের ওপর উঠে এলে সেই আলতাফ মৌলবি তাদের বলে, 'আল্লা তগো একছটাক বুদ্ধি দেয় নাই, জাহেল কর‍্যা রাখছে, কওতো জাহেলে জানোয়ারে তফাৎ কী?' হারুন মৃধা নিঃস্বকে পাগল আর আলতাফ মৌলবি ভূমিহীনদের জাহেল বলে শনাক্ত করে।

বাঁধের ব্যাপারে আলতাফ মৌলবিদের দুশ্চিন্তার কারণ সহজেই অনুমেয়। বাঁধ ভেঙে গেলে থানা, স্কুল, হাসপাতাল কিছুই থাকবে না। থানা কাছে

থাকলে তারা নিরাপদ থাকে, হাসপাতালে তাদের ভালো চিকিৎসা হয় আর স্কুলে তাদেরই ছেলেরা লেখাপড়া শিখে 'ডিস্ট্রিক্ট ফুড অফিসে' চাকরি পেতে পারে। কিন্তু এগুলোর থাকা না থাকায় উদ্বাস্তু কিষাণদের জীবনে কোনো হেরফের হয় না। অভাব এদের এতই অজ্ঞ করে রেখেছে যে সস্তায় পেলে বৃদ্ধ কিষাণ গায়ে দেওয়ার জন্য ব্লাউজ কিনে ফেলে এবং সেটা গায়ে দিয়ে বসেও থাকে লজ্জাহীন। স্কুলে পড়তে পারলে এরা আর জাহেল থাকে না, সম্মান ও সম্পদ বলতে তাদের যেহেতু কিছু নেই, সে কারণে সেসব রক্ষার জন্য তাদের থানারও খুব প্রয়োজন পড়ে না। বাঁধের ওপর আশ্রয়টুকু ওদের বড় পাওয়া, বাঁধ ভেঙে গেলে কাল ওরা কোথায় যাবে, সে ভাবনার শক্তি ও অবকাশ কোনোটাই তাদের নেই। কিসমতের ছেলে আকালু আলতাফ মৌলবির ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেদেরই উপহাস করে, 'জমি তো আমাগো আছেই। আমাগো জমি বান্দের ওপরে। আমরা বান্দের জমিদার।'

২৪/২৫ বছর বয়সী তরুণ, যমুনার ভাঙনে তার ৭ বছরের শিশুর সলিলসমাধি ঘটলে যমুনার জলের দিকে তাকিয়ে সে বিলাপ করে। সে কেন বাঁধ ছেড়ে যায় না, এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। তার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। ইলিয়াস এসব সরাসরি বলেন না, কেবল দৃশ্যগুলো তুলে ধরেন। তাতে নদীর ভাঙন এবং আলতাফ মৌলবিদের শোষণের মাঝখানে ক্ষুধাপীড়িত অসহায় মানুষদের নিদারুণ অবস্থা মূর্ত হয়ে ওঠে। নদীর ভয়ানক রূপের সঙ্গে সঙ্গে আলতাফ মৌলবিদের রূপও হয়ে ওঠে ভয়ংকর।

বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত-বিত্তহীনদের নিয়ে রাজনীতি করা সত্ত্বেও তাদের ভেতরের অবিশ্বাস, মুৎসুদ্দি চরিত্র এবং বিত্তহীনদের সমস্যাগুলো উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য বাম রাজনীতি এবং এর নেতা-কর্মীরা বারবার ইলিয়াসের আক্রমণের বিষয় হয়ে উঠেছে। 'উৎসব' গল্পে তাঁর এ আক্রমণের শুরু; চূড়ান্ত বিশ্লেষণ দিয়েছেন প্রথম উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*-এ। এ গল্পে বাম যুবনেতা আতিকের বড় ভাইয়ের চরিত্র দুটি বাক্যে ধরা পড়ে :

> দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না বলে বড়ো ভাইয়ের আক্ষেপের সীমা নেই। গুলশানে বাড়ি করে সমাজতান্ত্রিক কোনো দেশের এ্যামবাসিকে ভাড়া দিলে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে একটা লিঙ্ক থাকে, মাসে মাসে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকাও আসে। (পৃ-৪৪)

—এভাবে দেশের নিঃস্ব ভূমিহীনদের জীবন-সংকটের কথা বলতে গিয়ে তাদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে যে শিক্ষিত সুবিধাবাদীরা ফায়দা লুটছে, তাদের চেহারাও লেখক খুলে দিয়েছেন।

আতিকের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের নানা প্রবণতাকে ধারণ করেছেন লেখক। তার বাবার মতো সে-ও আলতাফ মৌলবিকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু জমি বিক্রয়ের ব্যাপারে নির্ভর করে আলতাফের ওপরই। তাদের বর্গাচাষি কিসমত সিকদারের ভাঙা গলার ডাকে সে ভয় পায়, 'জমির বর্গাচাষীর দল কি এসে পড়লো।'—এ ভয়ের জন্য আবার সে লজ্জাও পায়।[৭] উঠোনে কিসমতের বড় ছেলের বউয়ের পাশে কিসমতের বউ গিয়ে উপস্থিত হলে সে ভাবে, 'ওরা কি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে?' আবার তার বাবার সঙ্গে কিসমত সিকদারের সম্পর্ক ভালো ছিল, ফলে সে জমি বিক্রি করে দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলতেই পারে না। সন্দেহ-অবিশ্বাসের সঙ্গে সংকোচ তার ভেতরে একইসঙ্গে উপস্থিত হয়। ফলে সে স্বাভাবিকভাবেই আলতাফ মৌলবির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের বর্গাচাষি কিসমত এখনো জ্যোৎস্না রাতে তার মৃত বাবাকে 'মাচার উপরে বস্যা খালি ঝিমা'তে দেখলে আরেকটি জ্যোৎস্না রাত আসার ভয়ে দিন থাকতে থাকতে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যায়। জমি বিক্রি করে গ্রাম থেকে টাকা নেওয়ার জন্য দুই বড় ভাইয়ের চাপ, আলতাফ মৌলবির বিরক্তিকর চরিত্র, কিসমতের মুখে নিজের মৃত বাবার স্মৃতিবর্ণনা, কিসমতের বাত-ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের বিলাপ, বড় ছেলের কানা বউয়ের এক চোখের ঝকঝকে দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যই আতিক জমি বিক্রির পুরো দায়িত্ব আলতাফ মৌলবির ওপর ছেড়ে দিয়ে দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়।

আতিক আসলে কিসমতদের দেখে একটা সমবেত অবস্থার ভেতর, আলতাফ মৌলবির বিরুদ্ধে কিসমতের ছেলে আকালুর ক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে মূলত উদ্বাস্তু কিষাণদের ক্ষোভই ঝরে পড়ে। আতিকের ভয়ের মধ্য দিয়ে তার মধ্যবিত্ত মানসিকতাই কেবল স্পষ্ট হয়নি, লেখক বিত্তহীন শ্রেণীর একটি সংঘবদ্ধতার ইঙ্গিতও দিয়ে যান।

গল্পটির কোনো কোনো সংলাপ ও চরিত্র উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হয়। সাহিত্য উদ্দেশ্যহীন কিছু নয়, কিন্তু গল্পে ঘটনা-চরিত্র-সংলাপের স্বাভাবিকতার মধ্যেই আমরা লেখকের উদ্দেশ্যের সাফল্য অন্বেষণ করি। কোথাও উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে উঠলে গল্পের সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে। জমি বিক্রয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপনের পর যখন কিসমত সিকদার, যার ওই জমি চাষ ছাড়া অন্য অবলম্বন নেই, যার এক সন্তান মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছে, ছয় আনি জমি মৌলবির দখলে গেছে, সে, কোনো গুরুতর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না, তখন আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। মনে রেখেছি যে, জীবন কখনো কখনো গল্পের চেয়ে বিস্ময়কর, তবে গল্পকে সব সময়ই জীবনের মতো বিশ্বাস্য হতে হয়।[৮] কিসমতের এই সরাসরি প্রতিক্রিয়াহীনতা

বিশ্বাস্য হয়নি। কিসমত কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না, না করার কারণও অভিব্যক্ত হয় না। ফলে গল্পটির ঘটনার অগ্রসরণ কিছুটা কল্পনামুখী হয়ে পড়ে এবং আতিকের বাবাকে রাতে মাচার ওপর ঝিমোতে দেখার প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে জয়নাব বিবির এক ছেলে ছিল কানা। এখানে কিসমতের বড় ছেলের বউ কানা, এক ছেলে বাত-ব্যাধিগ্রস্ত, কিসমত চোখে দেখে না—এদের দেখে মনে হয়, জীবনকে ইলিয়াস বড় নোংরা, কদর্য, বীভৎসরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, ওই রূপটিই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তাকে তিনি অবিকল উপস্থিত করেছেন।

'পায়ের নিচে জল' গল্পের সমাপ্তিতে কিছুটা আকস্মিকতা আছে। সেই আকস্মিকতা আতিকের পলায়নের মধ্যে নয়, মাচার ওপর আতিকের মৃত বাবাকে ঝিমোতে দেখার মধ্যে। কিন্তু আমরা মনে রেখেছি :

> এই গল্পের কিছুটা নাটকীয় পরিসমাপ্তি সত্ত্বেও এর সাফল্যের দিকগুলো হচ্ছে নিপুণ আবহ সৃষ্টির কৌশলগত চমৎকারিত্ব আর তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধির নিজ নিজ অবস্থান নিশ্চিত রাখার প্রতিটি সতর্ক প্রয়াসের নিখুঁত বিশ্লেষণ।[৯]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পগুলোর মধ্যে 'দখল' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ ও রাজনীতির ক্ষয়জনিত অব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট মানুষের মনোবিকলন বিশ্লেষণ প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল প্রথম দুই গ্রন্থে। 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের মিলি চরিত্র পর্যন্ত এ বিষয় গড়িয়েছে। *দুধভাতে উৎপাত* গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্পে (নামগল্প) পটভূমির পরিবর্তন এবং লেখকের চিন্তা ও জীবনোপলব্ধি রূপান্তরের শুরু। 'পায়ের নিচে জল' গল্পে এই রূপান্তর অব্যাহত, শেষ গল্প 'দখল'-এ এসে লেখকের সে উপলব্ধি একটা চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছে। এ গল্পে লেখক কেবল সমাজক্রিয়াজাত মনোবিকার, আত্মদ্বন্দ্ব ও বৈরিতা দেখেননি, দেখেছেন বাংলাদেশের গ্রামসমাজে অল্প ভূমিসর্বস্ব এবং অসংখ্য ভূমিহীন মানুষের মধ্যে অস্তিত্বের প্রশ্নে সংঘবদ্ধতা; দেখেছেন যুগ যুগ ধরে টিকে থাকা শোষণ, বৈষম্যময় উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা, আধা সামন্ত ও আধা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণকারী শহুরে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি গ্রাম্য জোতদার ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী আধা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জনতার প্রতিরোধ।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে সংঘটিত স্বদেশি আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালের রাজনৈতিক শোষণ-অবক্ষয়কে এই গল্পে খোলামেলাভাবেই উন্মোচন করা হয়েছে।

পুরুষানুক্রমে মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিবার গ্রামে শোষণ চালিয়ে আসছে। এই পরিবারেই জন্ম নিয়েছিল যৌবনে শ্রেণীচ্যুত বিপ্লবী মোবারক হোসেন।[১০] কলকাতায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মোবারক সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর গ্রামের কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে গিয়ে সে বন্দী হয়; জেলেই তাকে হত্যা করা হয়। মোবারকের 'শহুরে' স্ত্রী তার বাড়িতে জায়গা পায়নি। ৮/৯ মাসের শিশু ইকবালকে সে মানুষ করেছে ঢাকায়। ১৯৭৩ সালে নিজের গ্রামে এসে পিতামহ মোয়াজ্জেমের মুখেই ইকবালকে শুনতে হয়, 'শরিয়ত মতে বাবা বেঁচে থাকতে ছেলের মৃত্যু হলে মৃত পুত্রের ছেলে মেয়ে কিছুই পায় না।' এভাবে শুরুতেই মোয়াজ্জেম হোসেনের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইকবাল গ্রামে আসার পরই গল্পের শুরু, পরে বিভিন্ন জনের স্মৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রাক্তন ঘটনা, বিশেষ করে বিপ্লবী মোবারক সম্পর্কে জানা যায়। ইকবাল গ্রামে থাকা অবস্থায় সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহকে ইলিয়াস তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে চরিত্রের (ইকবালের) ভেতর দিয়ে দেখেছেন। ইকবাল প্রত্যক্ষ করেছে পিতামহ মোয়াজ্জেমের লোভ, মুজিব কোট গায়ে দিয়ে মোটরসাইকেলে চেপে চাচা মোতাহারের শহর-গ্রাম করা, এই পরিবারের সঙ্গে গ্রামের নিঃস্ব কৃষকদের শীতল সম্পর্ক, রক্ষীবাহিনীর আনাগোনা, কৃষকদের 'টোটাল এ্যানিহিলেশন'-এর পরিকল্পনা এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের গ্রামে এই বাস্তবতা রয়েছে যে, সাধারণত, অল্প ভূমির মালিক কৃষকেরা যাদের বাড়িতে কামলা খাটে, অভাবের সময় তাদের কাছেই নামমাত্র মূল্যে সামান্য জমিটুকু বিক্রি করে। এখানে, বংশপরম্পরায় মোতাহারদের বাড়িতে কামলা খেটে ভেদু প্রামাণিক অন্যের কাছে জমি বিক্রি করেছে—এ যেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা, এর জন্য ভেদুর ওপর মোতাহারের রাগও বেশি। 'পায়ের নিচে জল' গল্পে ঝরু প্রামাণিক মধ্যস্বত্বভোগী ও জোতদার আলতাফ মৌলবির কাছে জমি না বেচে নগদ টাকার আশায় অন্যের কাছে জমি বিক্রয় করেছিল। মৌলবিও স্বভাবতই ঝরু প্রামাণিকের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল, তার ক্ষমতা অবশ্য মোতাহারের মতো নয়। মোতাহার সরাসরি পার্টির লোক, গায়ে মুজিব কোট, পেছনে রক্ষীবাহিনী। তার শক্তি আলতাফ মৌলবির চেয়ে বেশি, তার শোষণ-নিপীড়ন আরও তীব্র। দুই গল্পের ঝরু ও ভেদু বংশপরম্পরায় আলতাফ-মোতাহারদের জমিতে কামলা খাটবে, বাস করবে তাদের পায়ের নিচে, এটাকেই তারা সত্য বলে জেনেছে। 'দখল' গল্পে তার নগ্নরূপ যেমন আছে, তেমনি আছে মোতাহারদের বিরুদ্ধে ভেদুদের সংঘবদ্ধতা।

কাগজে-কলমে যারা ভূমির মালিক এবং যারা ওই ভূমিতে ফসল ফলায় অথচ ভূমিহীন—উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক। এখানে সেই ঐতিহাসিক নিয়মেই দ্বন্দ্ব হয়েছে। দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু উপাদান-উপকরণ কাজ করে। এখানে দ্বন্দ্বকে ঘটনাবহুল করেছে জোতদার মোয়াজ্জেম হোসেন, তার ছেলে মোতাহার ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী আধা সামরিক বাহিনী। মোয়াজ্জেম হোসেনের চালাকি, স্ববিরোধিতা এবং কপটতা ইকবালের ভাবনার মধ্য দিয়ে ভাষা পায় :

> মানুষের হৃত-অধিকার উদ্ধার করতে গিয়ে ছেলে জেলখানার মধ্যে মরে পুলিশের গুলিতে, পরে তুমি শালা বুড়ো শয়তান তোমার আরেক ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে রক্ষীবাহিনী নিয়ে আসো গ্রাম উজাড় করার জন্য! আবার শালা শহীদ ছেলের সঙ্গে পাশাপাশি থাকার আয়োজন করে।[১১] (পৃ-৫৫)

ইকবালের উদ্দেশে বলা ভেদু প্রামাণিকের উক্তিতে লেখক মোতাহার চরিত্রকে মূর্ত করেছেন, 'তাঁই পয়সার জোঁক পিঁপড়ার গোয়া টিপ্যা তাঁই গুড়ের অস বার করে, তাঁই তোমাক জমির ভাগ দিবি?' (পৃ-৫৯)

জলের ভেতর থেকে যার জমিই জেগে উঠুক, মোয়াজ্জেম চাষা লাগিয়ে তাতে চাষ করে। সেই চাষারা দলবদ্ধভাবে সে ফসল কেটে নিয়ে গেলে মোতাহার বিরক্ত হয় জমিজমা নিয়ে খটকা বাঁধলে চাষারা কোর্টে যায় না বলে। সে বোঝে না, 'যে সবুজ ও লাল পতাকার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিলো সেই পতাকা শোভিত কোর্টের প্রতি এত অবহেলা কেন?' (পৃ-৫৬)

ইলিয়াস দেখাচ্ছেন, এর কারণ সহজ। যুদ্ধে দেশের গ্রাম ধ্বংস হয়েছে, গ্রামের মানুষই বেশি নিপীড়িত হয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে পাওয়া ওই রক্তশোভিত পতাকা বিভিন্ন কারণে তাদের অধিকার ও অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি। স্বাধীন দেশে থানা, কোর্ট শেষ অবধি বঞ্চিত মানুষের স্বার্থরক্ষায় সহায়ক হতে পারেনি। ফলে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে কখনো কখনো নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না।

কৃষকদের সব ধরনের কর্মকাণ্ড মোয়াজ্জেম-মোতাহারদের মধ্যে বিরক্তি জাগায়। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে সংঘটিত স্বদেশি আন্দোলন চলাকালে স্বদেশিরা বিলেতি কাপড়ে আগুন দিলে সেই আগুনের 'লেলিহান শিখা দেখে মোয়াজ্জেম হোসেনের জানটা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, আর, দ্যাখো রাজ্যের শালার চাষাভূষা সেই আগুনে হাত পা সেকে নিচ্ছিল।' (পৃ-৫১) স্বদেশি আন্দোলন এ দেশের ভূমিহীন কৃষকদের সম্পৃক্ত করতে পারেনি, এ কথা

ঐতিহাসিক সত্য[১২], কারণ, তাতে কৃষকদের স্বার্থ জড়িত ছিল না। শীতের দিনে উদোম শরীরে একটু উষ্ণতা তাই তাদের বড় পাওয়া। 'পায়ের নিচে জল'-এ যেমন দেখেছি, নদীর বাঁধ ভেঙে স্কুল-থানা-হাসপাতাল বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তাদের বিচলিত করেনি, কারণ, প্রতিষ্ঠানগুলোর থাকা না থাকাতে তাদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু যে বিশাল জমি পানির তলায় ছিল, সে জমি জেগে ওঠার পর তার পুরোই যখন মোয়াজ্জেম হোসেন দখল করে বসল, তখন কৃষকদের পক্ষে আর নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব হয়নি; কারণ, এর সঙ্গে তাদের স্বার্থ সরাসরি জড়িত।

যুগ যুগ ধরে জোতদারদের শোষণ, কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়া, তাদের ভেতরে বেদনা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত করেছিল। এ ছাড়া মোবারক হোসেন যে জেলে প্রাণ দিয়েছে, সে একদিন এদের সঙ্গে মিশে ঘানি টেনেছে, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন চেতনায়—ভেদু প্রামাণিক সেই বিশ্বস্ত সঙ্গীর মৃত্যুর বেদনা ও নিজের শ্রেণীর মানুষের শোষণ-বঞ্চনার ক্ষোভ নিয়ে এখনো বেঁচে আছে। জোতদার ও রক্ষীবাহিনীর নিপীড়নে চাষাদের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, সে সময় ভেদু প্রামাণিকের নেতৃত্বে তারা সংঘবদ্ধ হয়। কোনো রাজনৈতিক দলের[১৩] কর্মী হিসেবে নয়, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বর্গাচাষা আকালু সেই চতুর্থ দশকে একদিন জমির মালিককে সময়মতো ফসল দিতে পারেনি, আর দুবেলা ভাত না দিলে বেগার কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ইলিয়াস দেখিয়েছেন, যে অস্তিত্বের স্বার্থে একজন আকালু জোতদারের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অস্তিত্বের স্বার্থেই আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে থ্রি নট থ্রি রাইফেল এবং কাস্তে-সড়কি-লাঠি-দা হাতে হাজার হাজার মানুষ রক্ষীবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে জোতদার তথা মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। সংঘবদ্ধ মানুষের এই প্রতিরোধ-অভিযান প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীসংগ্রামেরই ইঙ্গিত বহন করে।[১৪] এর বাস্তব দিক নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে সমবেতভাবে কৃষকদের এগিয়ে আসার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে (স্মর্তব্য: তেভাগা আন্দোলন।) কৃষকদের এই সংঘবদ্ধতার ঐতিহাসিক সত্যকে লেখক যেমন অবলম্বন করেছেন, তেমনি তাদের নিয়ে লেখকের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নেরও প্রতিফলন দেখাতে চেয়েছেন।

ইলিয়াসের গল্পে সর্বশ্রেণীর মানুষের স্বার্থপরতা, নীচতা, পরস্পরবিরোধী আচরণের নির্মম বর্ণনা আছে, সেখানে কোনো চরিত্রের প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই। 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে মায়ের মৃত্যুশয্যার আশপাশে দাঁড়ানো ক্ষুধার্ত সন্তানদের স্বার্থপরতার ছবি আঁকতে তাঁর হাত কাঁপেনি। কিন্তু 'দখল' গল্পে

আমরা অন্য এক ইলিয়াসকে আবিষ্কার করি, তাঁর জীবনোপলব্ধির একটা নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করি। এখানে তিনি চাষাভূষাদের ব্যঙ্গ করেননি বা তাদের জীবনের প্রতি নেতি-দৃষ্টি রাখেননি, বরং তাদের প্রতিরোধ-অভিযানকে মানবসমাজের জীবনসংগ্রামের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে দেখেছেন, এই অভিযানে তিনি নিজেও কখনো বা ওতপ্রোত হয়েছেন মানসিকভাবে, তাতে এই গল্পের শিল্পসাফল্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, প্রশ্ন ওঠার অবকাশ তৈরি হয়েছে ঘটনার বাস্তবতা নিয়ে। এ প্রশ্ন থেকে তিনি অনেকটাই অব্যাহতি পেয়ে যান এই বাস্তব উপলব্ধির কারণে :

> ইকবাল এটুকু জানে যে, এই গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ বড়জোর সকাল পর্যন্ত টিকবে। বগুড়া কি রংপুর শহর থেকে রক্ষীবাহিনীর বড়ো দল আসছে। রক্ষীবাহিনীতে না কুলালে সেনাবাহিনী আসবে। কিন্তু তারা আসার আগেই এই বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। টিকে থাকবে কেবল ওর বাপের কবর। (পৃ-৬৪)

আমাদের দেশে জোতদারেরা গ্রাম বা উপশহরে কেন্দ্রীয় বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার মাধ্যম। মোয়াজ্জেম হোসেনরা নিশ্চিহ্ন হলে কেন্দ্রীয় শাসন টলে যাবে। অতএব ইলিয়াস আশাও রেখে গেছেন যে, সেনাবাহিনী আসতে আসতে অন্তত একটি বাড়ি ধ্বংস হবে, একটা শোষক পরিবার ধ্বংস হবে। শ্রেণীসংগ্রামে মানুষের জয়ের বন্ধুর পথে এই একটি বাড়ি নিশ্চিহ্ন হওয়ার নিশ্চয়তা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত।

লেখকের নির্লিপ্তি এ গল্পে আগের অনেক গল্পের মতো ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ সূক্ষ্মতর হয়েছে। ফলে তিনি নিজস্ব জীবনদর্শন বা স্বপ্নকল্পনায় একেবারে একাকার হয়ে যাননি। ইকবাল চরিত্রটি নির্মাণের ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামকে একটি নতুন মাত্রা দেওয়ার প্রয়োজনে অথবা বিপ্লবী রক্তের উত্তরাধিকারকে অধিকতর মহত্ত্বে উদ্ভাসিত করার জন্য আশাবাদী মানুষের মতো কিছুটা রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার আশ্রয় নেওয়ার লোভ সংবরণ করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।[১৫] এ জন্য ইকবালকে বাবার মতো বিপ্লবে দীক্ষা নিতে বা বাবার একসময়কার সঙ্গী ভেদু প্রামাণিকের সঙ্গে একীভূত হতে দেখা যায়নি। ঢাকায় অবস্থান ও শিক্ষা তার মানসিকতাকে করেছে দোদুল্যমান ও পলায়নপর। তাই রাতে বাবার কবরে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর আগমন সম্পর্কে একটা সংকেত দেওয়ার জন্য ভেদুর অনুরোধ রক্ষা করতে পারেনি সে। উল্টো চাষাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের সময় সে তার বাবার কবরের পাশে তৈরি দাদুর খালি কবরে আশ্রয় খুঁজেছে।

ইলিয়াস জীবনকে যে রূঢ় ক্লেদাক্ত অবস্থার মধ্যে দেখেন ও নির্মম ভাষাভঙ্গিতে তাকে উপস্থাপন করেন, 'দখল' গল্পে তার অনেক কিছু উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার দেখার মধ্যে একটা পরিবর্তন-রূপান্তর সাধিত হয়েছে। অন্যান্য গল্পে যেখানে সমাজবাস্তবতা মানুষের মনোবিকার ঘটায়, এ গল্পে সেখানে সমাজবাস্তবতা সামাজিক অব্যবস্থাকে সাহসী পদক্ষেপে প্রতিরোধ করতে, তার মুখোমুখি দাঁড় করাতে মানুষকে প্রেরণা দেয়।

তথ্য-সংকেত

১. ইলিয়াসের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ (১৯৮৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫) গল্প : ১. মিলির হাতে স্টেনগান; ২. দুধভাতে উৎপাত; ৩. পায়ের নিচে জল; ৪. দখল।

২. *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬) ও *খোঁয়ারি* (১৯৮২)

৩. গল্পের সময়কাল কৌশলে জানান ইলিয়াস। নীল আর্মস্ট্রংয়ের চন্দ্রাভিযানের প্রসঙ্গ আনে আব্বাস। ১৯৬৯ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত গুনে আব্বাস বলে : 'চাইরাটা বছর ভি পুরা হয় নাই, অকুপেশন আর্মি গিয়া চান্দের বহুত এরিয়া ক্যাপচার কইরা রাখছে, বুঝলি?' এই ৪ বছরের ব্যবধানে লেখক বুঝিয়ে দেন সময় ১৯৭৩। আব্বাসের ভাইয়ের মতে মুক্তিযুদ্ধের ২ বছর আগে আব্বাসের পাগলামির শুরু।

৪. প্রাচীন যুগের সাহিত্য চর্যাপদে 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী' আর মধ্যযুগের সাহিত্য ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ঈশ্বরী পাটনির 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—ইত্যাদিতে বাঙালির ক্ষুধার কথা আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে ভিক্ষা পাওয়ার জন্য শুকিয়ে যাওয়া ঘাকে খুঁচিয়ে চাঙা করতে দেখেছি। মানিকের 'চোর' গল্পটির কথাও উল্লেখ করা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে উপলব্ধি তীব্রতর।

৫. 'বুইড়া মরদটা! কী দ্যাহস? গোরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী দ্যাহস!' প্রায় অচেতন জয়নাব বিবির এই তিরস্কারের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, সে এ ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে চাইছে।

৬. পরবর্তী গল্পগ্রন্থ *দোজখের ওম*-এর (১৯৮৯) 'কীটনাশকের কীর্তি'তে অতঃপর তিনি বঞ্চিত মানুষের জীবনকে ধারণ করতে গিয়ে গ্রাম ও নগরকে একাকার করেছেন।

৭. ইলিয়াসের উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*-এর আনোয়ার চরিত্রের সঙ্গে তার মিল আছে। সে চেংটুর বাবাকে ভয় ও অবিশ্বাস করে বলে গ্রাম থেকে চলে আসার সময় চেংটুর বাবা যখন চাদরের ভেতর থেকে তার জন্য পিঠা বের করছে, তখন সে ভাবে, তাকে মারার জন্য অস্ত্র বের করছে না তো!

৮. আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *কথা ও কবিতা*, ১৯৮১, ঢাকা, পৃ-১০৭।

৯. ইফতেখারুল ইসলাম: 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দুধভাতে উৎপাত', *নিরন্তর*, তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৩৯৪, ঢাকা। সম্পাদক : নাঈম হাসান। পৃ-১৮০।

১০. মোয়াজ্জেম হোসেনের এই সন্তানের জন্ম ১৯২৬ সালে, স্বদেশি আন্দোলনের সময়।

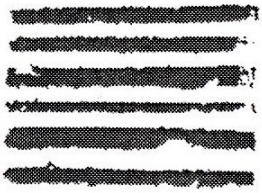
১১. মোয়াজ্জেমের ছেলে ইকবালের বাবা মোবারক মূলত উৎখাত করতে চেয়েছিল মোয়াজ্জেমের মতো লোকদেরই, চেয়েছিল ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। তার দর্শনের সঙ্গে মোয়াজ্জেমের ভাবনার অবস্থান মেরুদূরত্বে। কিন্তু আবার সে মৃত ছেলের জন্য গর্ব করে, তার কবরের পাশে নির্ধারণ করে নিজের কবরের জায়গা।

১২. 'জমিদার তালুকদার অধিকাংশই হিন্দু হওয়াতে অত্যাচারিত, অবহেলিত মুসলমান কৃষক হিন্দু ও কিছুসংখ্যক মুসলমান নিয়ে সংগঠিত স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক।'—নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০ ঢাকা, পৃ-২২৩-২২৪।

১৩. যে বামপন্থী সংগঠন কৃষকদের সংগঠিত করতে পারত, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সে সংগঠন যথোচিত ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সে সংগঠনের নেতা ইকবালের বড় মামার চরিত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া সংগঠনগুলোর নেতাদের চরিত্রের তফাত নেই—'বড়োমামা এখন কতো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। গভর্নমেন্টে না থাকলে কী হয়, মিনিস্টারদের চেয়ে কম কি? কথায় কথায় মস্কো যায়, হাঙ্গেরী যায়।' (পৃ-৬০) হাতের কাজ করা রাশিয়ার পুতুল দিয়ে মামানী আলমারি সাজায়। রাশিয়া হাঙ্গেরির সঙ্গে এদের যে যোগাযোগ, দেশের নিম্নশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাদের সে যোগাযোগ নেই। এরা ঢাকা থেকে বেরই হতে চায় না। 'উৎসব' গল্পে (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*) ইলিয়াস এদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন এভাবে: 'মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আতাহার এলে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল.পি. চালিয়ে দিয়ে স্যোসালিজম সম্বন্ধে গল্প করছে নরম গলায় : আবার এরই ফাঁকে ফাঁকে সময় করে লোনলিনেসে কি মিষ্টি কষ্ট পায়।' ('নিরুদ্দেশ যাত্রা' : *অন্য ঘরে অন্য স্বর*- পৃ-১৩)

১৪. ইফতেখারুল ইসলাম : প্রাগুক্ত-পৃ-১৮০।

১৫. ইফতেখারুল ইসলাম : প্রাগুক্ত-পৃ-১৮০।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দোজখের ওম

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *দুধভাতে উৎপাত*-এ যে গ্রামকে আমরা দেখেছি চতুর্থ গল্পগ্রন্থ *দোজখের ওম*-এর প্রথম গল্প 'কীটনাশকের কীর্তি'তে গ্রামের সেই পুরনো চেহারা বর্তমান রয়েছে, বিষয়ের দিক থেকে এ গল্পে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজধানীতে পুঁজির বিকাশের ফলে বেড়ে ওঠা ধনবান মানুষের বিলাসী জীবন, সমাজসেবার নামে আত্মপ্রচারণা। আমরা লক্ষ করি, ইলিয়াস আবার নগরের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। সেই নগরে আমরা দেখতে পেলাম, জীবনের তাগিদে, জীবিকার অন্বেষণে গ্রাম থেকে শহরে ছুটে আসা মানুষের জীবনযন্ত্রণার নিদারুণ আর্তনাদ। নগর থেকে গ্রাম এবং গ্রাম থেকে নগরের দিকে চোখ ফেরানো—এর মধ্যে তিনটি স্তর :

১. 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে প্রথম পরিপূর্ণ গ্রাম এবং সেখানকার মানুষের জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করি। এ গল্পে শোষক হিসেবে কোনো নাগরিক প্রতিনিধির উপস্থিতি নেই। হাসমত মুহুরির শহরে পড়া ছেলেকে একবার দেখা যায় বটে, তবে ঘটনায় সে কোনো ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে না।

২. 'পায়ের নিচে জল'-এ ইলিয়াস দেখিয়েছেন, গ্রামের অর্থ কীভাবে শহরে-নগরে চলে যাচ্ছে। নগরের প্রতিনিধি আতিক চলে এসেছে গ্রামে। 'দখল'-এ এসেছে ইকবাল, শহর থেকে রক্ষীবাহিনী, লেখক দেখালেন সব ধরনের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের চিত্র; একদিনের সে প্রতিরোধ-অভিযানকে দিয়েছেন প্রতীকী দ্যোতনা।

৩. 'কীটনাশকের কীর্তি'তে তিনি দেখালেন, জীবিকার জন্য গ্রামের মানুষের শহরে যাওয়া। গ্রাম ও শহরকে একাকার করে তিনি দেখিয়েছেন গ্রামের নিরন্ন ভূমিহীন মানুষের জীবন গ্রামে যেমন অনিশ্চিত, শহরেও তেমনি বিপর্যস্ত।

'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পে আমরা দেখি, নিরক্ষর রমিজ আলি সুখের সন্ধানে ধলেশ্বরীর তীর থেকে রাজধানীতে এসে বিত্তবান এক মানুষের বাড়িতে কাজ নিয়েছে। একদিন বাবার চিঠিতে, যে বুবুর সাথে তার ছেলেবেলাকার বহুমাত্রিক স্মৃতি জড়িত, তার আত্মহত্যার খবর জেনে দ্রুত বাড়ি যাওয়ার জন্য সাহেবের কাছে টাকা চাইতে যায় সে। কিন্তু সাহেবের কাছে টাকা চাওয়ার পরিবেশ সে তৈরি করতে পারে না। এদিকে বোনের মৃত্যুর জন্য বোনের স্বামী হাফিজুদ্দিন ও জোতদারের ম্যাট্রিক পাস ছেলে, যার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে বোন বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়েছিল, তাকে বোনের মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে সে—এদের প্রতি রাগ এবং সাহেবের কাছে বাড়ির অবস্থা বর্ণনা করে টাকা চাইতে না পারা—সব মিলিয়ে তার মধ্যে মনোবিকার উপস্থিত হলে সে সাহেবের মেয়েকেই বিষ খাইয়ে মারতে যায়। সাহেবের মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করার অপচেষ্টার অপরাধে বেধড়ক মার খেয়ে সে সারা রাত গ্যারেজে বন্দী থাকে এবং ভোরের দিকে মারা যায়।

ইলিয়াস রমিজ আলির ভেতর দিয়ে একাধারে গ্রাম ও শহরকে দেখেছেন, গ্রামে রমিজের পরিবারের শোচনীয় অবস্থাকে তুলে এনেছেন; তার মা, বুবু, হাফিজুদ্দি, গ্রামের 'ম্যাট্রিক পাস' ছেলে, সাহেবের মেয়ে, বউ, সাহেবের ট্রাকের ড্রাইভার—প্রত্যেকের চরিত্র স্পষ্ট করেছেন। যে জোতদারের বাড়িতে গ্রামের মানুষ কামলা খাটে, তাকে যে শুধু সর্বশেষ ভূমিটুকু দিতে হয় তা নয়, দিতে হয় নারীর সম্ভ্রমও। যে বাড়িতে রমিজের মা ও বোন কাজ করত, তাদেরই ম্যাট্রিক পাস ছেলে, গল্পে যার নাম নেই, তার লোভের শিকার হয় বুবু অসিমুন্নেসা। সে অসিমুন্নেসার চোখে স্বপ্ন এবং গর্ভে সন্তান দিয়ে অন্তর্হিত হয়। নিজের দোকানের কর্মচারী হাফিজুদ্দির সঙ্গে বিয়ের পর হাফিজুদ্দিকে ঢাকায় পাঠিয়ে সে অসিমুন্নেসার দরজায় টোকা দেয়। তার হাত থেকে বাঁচার জন্য অসিমুন্নেসা বাপের বাড়ি চলে এলে সে ফতোয়া দিয়ে বেড়ায় :

> চাকর বলে কি হাফিজুদ্দি মানুষ নয়? তার কি আখেরাত নাই? বিয়ের আগে যে মেয়ে পেট বাঁধিয়ে বসে তার সঙ্গে সে হাফিজুদ্দিকে ঘর করতে বলে কোন বিবেচনায়? (পৃ-২৩)

এভাবে 'ম্যাট্রিক পাস শিক্ষিত লোক', যার রয়েছে জমিজমা, হালের গরু, কিষাণপাট, সিঙাইরে মনিহারির দোকান, পাটের আড়ত—সে কেবল অসিমুন্নেসার সম্ভ্রমই নষ্ট করেনি, তার ঘর ভাঙার ব্যবস্থা করে তাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে।

কিন্তু এই মৃত্যুর জন্য রমিজের বাবাদের শোকের অবকাশ নেই। কারণ, এর পরে যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তা-ই হয়ে ওঠে বিবেচনা ও দুশ্চিন্তার

বিষয়। অসিমুন্নেসার আত্মহত্যার খবর রমিজকে জানাতে গিয়ে বাবা এ কথা লিখতে ভোলে না যে, 'দারগা পুলিশে একুনে ৩ টাকা কম ২৫০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।' যে আসমত আলির জমি সে চাষ করে, সে তার পাওনা টাকার (২৪৫ টাকা) জন্য পুলিশ দিয়ে বেইজ্জত করবে বলে শাসাচ্ছে। এ অবস্থায় ওই মৃত্যু তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি যে, যে ম্যাট্রিক পাসের জন্য অসিমুন্নেসাকে মরতে হয়, পুলিশ তার কিছুই করে না; আর অসিমুন্নেসা মরেও তার বাবাকে রক্ষা করতে পারে না পুলিশের হাত থেকে। আধা সামন্ত আধা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুলিশ ও যাবতীয় প্রশাসন জোতদার শ্রেণীর জন্যই সংরক্ষিত, বলা বাহুল্য।

পুরান ঢাকার মানুষ, তাদের সংলাপ, ইলিয়াসের গল্পে বিশেষ প্রাণ পায়। সাহেবের ট্রাকচালক এই পুরান ঢাকার মানুষ, তার সংলাপেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্রাকচালনা শেখানো আর মাছ-গোশতের টুকরোর বিনিময়ে সে রমিজ আলিকে নিজের ঘরে শোয়ায়, কিন্তু 'আকামের সঙ্গী'কে ট্রাকে তার চালকের 'পবিত্র' আসনে বসতে দেয় না। নিরক্ষর রমিজকে সে তার বাবার লেখা চিঠি পড়ে শোনায় আবার রাতে হানে চরম আঘাত :

> তর বইনের কি হইছিলো আমি জানি না, না? গেরাইম্যা মাগীগো আমার বহুত চেনা আছে, বুঝলি? টেরাক লইয়া আরিচা নগরবাড়ি দুইদিন তিনদিন কইরা থাকি না? ক, থাকি না? দুইটা ট্যাকা দিয়া পাটের খ্যাতের মইদ্যে লইয়া খানকি গুলিরে খালি ঠাপাও, খালি ঠাপাও। (পৃ-২০)

শ্রেণীগতভাবে সোনামিয়া রমিজ আলির চেয়ে কিছু ওপরে নয়, ঢাকা শহরে থাকলেও রমিজ আলির বোনদের চেয়ে সোনামিয়াদের বোনদের অবস্থা কিছুমাত্র ভালো নয়। এসব কিন্তু সে বোঝে না। রমিজ আর গ্রামের মেয়েদের ব্যবহার করে সে অতৃপ্তি ঘোচায়, আস্ফালনের ভেতর দিয়ে ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টা করে। একইসঙ্গে সে বহন করে পবিত্রতা সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা।

গল্পটির বিষয় তেমন অভিনব নয়। কাজ করতে গিয়ে গ্রামের যুবতী নারীর প্রতারিত হওয়া, স্বামীর যৌতুক দাবি, বিয়ের পরও জোতদার-নন্দনের লোভ, উদ্দেশ্য চরিতার্থ না হলে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া, শহরের সাহেবদের বিলাসী জীবনযাপন, মানুষের চেয়ে অ্যালসেশিয়ানের অধিক মূল্যায়ন, সাহেব-বউদের নারী-নির্যাতন প্রতিরোধের নামে দেশ-বিদেশে ঘোরাফেরা, টেলিভিশনে মুখ দেখানোর লজ্জাজনক প্রচেষ্টা—এসব নতুন কিছু নয় বাংলাদেশের গল্পে। অবশ্য বিষয়কে লেখক কীভাবে উপস্থাপন করছেন, সেটি একটি বিবেচনার বিষয়, এ গল্পে সে অর্থেও তেমন কোনো মাত্রা যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না।

রমিজ আলির মনে বিকার সৃষ্টির কারণ নিজেদের অক্ষমতা, এই অক্ষমতা ঘোচাতে সে সাহেবের মেয়েকে বিষ খাওয়াতে যায়। সে ভাবে :

> তখন দ্যাখ্যা যাবে—কি করে বছরের একদিন লাল পাড় হলুদ শাড়ি পরে, লাল টয়োটা হাঁকিয়ে পান্তাভাত খাওয়ার রঙ ফলাতে যায় রমনা পার্কে, তখন দেখা যাবে সখের খালি পা করে অর্ধেক হেঁটে আর অর্ধেক গাড়ি করে চলে যায় মেডিক্যাল কলেজের ওখানে শহীদ মিনারে (পৃ-২৪) ইত্যাদি।

এর মধ্য দিয়ে শহুরে মধ্যবিত্তের মেকি দেশপ্রেম ও সংস্কৃতিচর্চার বিষয়টি মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু রমিজের মাথায় এসব বিষয় এভাবে আসার বাস্তবতা লেখক তৈরি করতে পারেননি। ফলে, মেকি জীবনের প্রতি এই ক্রোধ লেখকের নিজের ক্রোধ হয়েই থেকেছে। এ ছাড়া, সাধারণত চরিত্রের ভাবনা তারই ভাষায় উপস্থাপন করেন লেখক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধলেশ্বরীর তীরের উপভাষায় আশ্রয় নেওয়া হয়নি, ফলে এখানে রমিজ তার বাস্তবতাসহ জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

তবে শেষ পর্যন্ত ইলিয়াস এ গল্পকে একটা যৌক্তিক পরিণতি দিতে পেরেছেন। সেখানে রমিজ পরাজিত, বন্দী, অসহায়। রমিজের এই বন্দিত্ব ও অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে লেখক শহরে আশ্রয়প্রার্থী ভূমিহীন নিম্নশ্রেণীর মানুষের অসহায়ত্ব ও বন্দিত্বকে তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে রমিজ আলির ক্রোধের ভেতর দিয়ে অসহায় মানুষের একটা অন্তঃসত্ত্বা জাগাতে চেয়েছেন লেখক, যদিও তা 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পের মতো ইঙ্গিতময় ও শিল্পময় হয়ে ওঠেনি।

'যুগলবন্দি' ইলিয়াসের কোনো প্রধান গল্প নয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বেড়ে ওঠা উচ্চমধ্যবিত্তের অদ্ভুত জীবনযাপন, ধ্যান-ধারণা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্তের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপসকামী ও চাটুকারী মনোভাব এ গল্পের বিষয়, যা আগের গল্পেও দেখা গেছে। 'উৎসব' (*অন্য ঘরে অন্য স্বর*) গল্পের বাংলার অধ্যাপক হাফিজের মধ্যে মধ্যবিত্তের আপসকামিতা আমরা দেখেছি।[২] আর 'কীটনাশকের কীর্তি'র সাহেব চরিত্রের নতুন সংস্করণ এ গল্পের সরোয়ার কবির। সে ও তার স্ত্রী আধুনিক জীবনযাপনের নামে পোষণ করে অদ্ভুত ধ্যান-ধারণা, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত আসগরের মধ্যে দেখা যায় চূড়ান্ত হঠকারিতা, স্ববিরোধিতা ও দোদুল্যমানতা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সরোয়ার কবিরের 'চাচাতো না মামাতো' দেওরের বন্ধু আসগর একটা বড় চাকরির আশায় তার বাসায় থেকে ফাইফরমাশ খাটে, কবির সাহেবকে খুশি করার জন্য রাত একটায় তার স্ত্রীর প্রয়োজনে লেবু কিনতে শহর চষে বেড়ায় আর তাদের প্রিয় অ্যালসেশিয়ানকে

পায়খানা করায়। আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে সে করতে পারে না, এমন কিছুই নেই। কিন্তু লেখক দেখাচ্ছেন, এই স্বপ্ন তাকে নিজেদের পারিবারিক জীবনের চৌহদ্দি থেকে কত দূরে নিয়ে গেছে। নিজের অবসরপ্রাপ্ত বাবা এবং গৃহিণী মায়ের আচার-আচরণ তার ভালো লাগে না। শতকরা ৭৫ ভাগ বেআইনি একটি কাজের স্বপ্ন দেখে সে, যেটা হলে বন্দরনগর চট্টগ্রামের অভিজাত এলাকা খুলশিতে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাসহ একটা বাড়ি হবে। এভাবে, প্রকৃতপক্ষে সে সরোয়ার কবিরকেই স্পর্শ করতে চায়। কবির সাহেবকে জীবনের মডেল মনে করার ফলে নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের একটা তুলনা তার ভেতর এসে পড়ে, কবির সাহেবের বাবার পাশে নিজের বাবাকে কখনো বসাতে (মনে মনে) না পেরে সে রক্তাক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কবির সাহেবের স্ত্রী ও কুকুর 'আরগস'কে সম্মান প্রদর্শন, পোর্ট থেকে ফ্রিজ সরিয়ে আনা এবং অবৈধ পয়সা উপার্জনের কৃতিত্বে সে যখন ক্রুদ্ধ পুরুষ সেজে মাঝরাতে মাদারবাড়িস্থ নিজের বাড়িতে আসে, তখন প্রয়োজনীয় কথা থাকা সত্ত্বেও ছেলের ধমক খাওয়ার ভয়ে অবসরপ্রাপ্ত ভীত বাবা রান্না ঘরে বসে থাকেন। তার প্রিয় খাবার সাজিয়ে মা যখন তাকে খেতে ডাকেন, তখন 'মেনু দেখে রাগে দুঃখে তার গা জ্বলে যায়। মায়ের দিকে তাকায় না পর্যন্ত।' এভাবে কবির সাহেবের ঘরে কুকুরের চেয়েও অসহায় অবস্থায় থাকা এক মধ্যবিত্ত যুবক নানা আস্ফালনের ভেতরে স্বস্তি খোঁজে।

সরোয়ার কবির আসগরকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না, আসগর প্রতিষ্ঠিত হলে তার কাজের জন্য আবার অন্য আসগরের সন্ধান করতে হবে। তাই দেখা যায়, আসগরের একটি কাঙ্ক্ষিত চাকরি 'মিনিস্টারের শালা না ভাইপো' পেয়ে যায়। তখন আসগরের সব ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে সত্য, কিন্তু এখান থেকে চলে গেলে 'ইহজীবনে' খুলশিতে ফার্নিশড বাড়িতে থাকা যাবে না। তার মধ্যে মাঝেমধ্যে মধ্যবিত্তের যে অহংবোধ জেগে ওঠে, তা স্থায়ী হতে পারে না, মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতার জন্য। 'উৎসব' গল্পের আনোয়ার, 'প্রতিশোধ' গল্পের ওসমান ও 'যুগলবন্দি'র আসগর—তিনজনই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত; আনোয়ার-ওসমানের মতো সে-ও প্রয়োজনীয় কথাটা ঠিক সময়ে বলতে পারে না।

উচ্চমধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক তাদের জীবনের উদ্ভট চিন্তা ও হাস্যকর প্রচেষ্টাকে নগ্নভাবে উপস্থিত করেছেন। নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনকে জানার পাশাপাশি উচ্চমধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লেখক কতটা অভিজ্ঞ, সরোয়ার কবির এবং জেসমিন কবিরকে

দেখলেই তা উপলব্ধি করা যায়। জেসমিন কবিরের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন দুটি বাক্যে :

> স্লিম হওয়া জেসমিন কবিরের জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তার চিন্তা-ভাবনা, তার সুখ-দুঃখ, বলা যায় তার দর্শন—ক্লাবে পার্টিতে সোসাইটিতে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা। (পৃ-৪২)

'দর্শন' শব্দটি প্রয়োগ করে লেখক চরিত্রটিকে হাস্যকর করে তুলেছেন। কুকুর আরগসকে নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিরোধ, তা মূলত তাদের নিজেদের জীবনের দর্পণ হয়ে উঠেছে। বডি স্লিম না হলে বিদেশি অ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে দেশি কুকুরের তফাৎ থাকে না—জেসমিনের এ ধারণার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, নিজেকে সে দেশীয় রমণীদের চেয়ে পৃথক ভাবতে চায়। কিন্তু সরোয়ার কবিরের মত হলো, বাউয়েলস ক্লিয়ার হলেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ সমস্যা আসলে তার নিজের সমস্যা। এ জন্য তিনি প্রয়োজনে সকালে স্ত্রীর সঙ্গে ইন্টারকোর্সে যান। স্ত্রীকে সম্মত করানোর ভঙ্গিও অদ্ভুত :

> সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইন দি আর্লি মর্নিং—আইদার অফ দীজ টু কিপ ইওর ফিগার স্লিম।—ব্যস্ এই থিওরিতে কাজ হয়। (পৃ-৪৭)

এদের জীবনযাপন-পদ্ধতিকে লেখক এভাবে হাস্যকর করে তোলেন। যে বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ, সেই একজনের 'দর্শন' ও অন্যজনের 'প্রধান বিবেচনা'র স্বার্থ একটি কেন্দ্রে উপস্থিত হয় সকালবেলা। রাজনীতির ক্ষয় এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব বর্ণনায় যেমন ইলিয়াস সিদ্ধহস্ত, তেমনি উচ্চবিত্তের জীবনযাপনের এই চিত্রগুলোর উপস্থাপনেও তিনি সমান সক্রিয়।

এ গল্পের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ইলিয়াস রাজধানী ঢাকাকে বাদ দিয়ে বন্দরনগর চট্টগ্রামকে বেছে নিয়েছেন। আসগর পোর্ট থেকে টু-ইন-ওয়ান সরিয়ে রেয়াজউদ্দিন বাজারে বিক্রি করে, আমেরিকান জাহাজের সেলারকে পটিয়ে কাস্টমসের লোক ও পুলিশকে ঘুষ দিয়ে ফ্রিজ নিয়ে আসে বাসায়—এসব ঘটনার ভেতর দিয়ে বন্দরনগর চট্টগ্রামের বন্দর ও কাস্টমসের অভ্যন্তর, পুলিশের চরিত্র, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-সুবিধাবাদীদের লুম্পেন চেহারা, একইসঙ্গে এই অবৈধ ব্যবসায়ে জড়িতদের অবয়ব খুলে দেন লেখক। রাজধানী ঢাকার মতো বাণিজ্যিক কেন্দ্র চট্টগ্রামও যে এক অশুভ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে, এ তথ্য আর গোপন থাকে না।

তবু গল্পটিকে আমরা অপ্রধান বলেছি; কারণ, ইলিয়াসের গল্পের বিষয়ে যে অভিনবত্ব, ভঙ্গিতে যে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ উপস্থিত থাকে—এ গল্পে তা নেই। কেবল এ গল্পে নয়, 'কীটনাশকের কীর্তি'তেও নেই। এ দুটি গল্পের বিষয়

যেমন অভিনব নয়, ভঙ্গিও তেমনি নয় নির্মোহ ও নির্মেদ। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অদ্ভুত, উদ্ভট ও দোদুল্যমান জীবন থাকলেও সব মিলিয়ে তা 'উৎসব' গল্পের মতো সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধ ইলিয়াসের গল্পে আগেও এসেছে অনুষঙ্গ হয়ে। 'খোঁয়ারি' (*খোঁয়ারি*) গল্পে সমরজিতের স্মৃতির মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি আর্মির গোলাগুলির ভেতর একদল মানুষের পলায়নের নিখুঁত বর্ণনা আছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ 'খোঁয়ারি'র মূল বিষয় নয়। মুক্তিযুদ্ধকে মূল প্রসঙ্গ করে ইলিয়াসের লেখা দুটি গল্পের একটি গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে *দোজখের ওম*-এ।[৩] গল্পের শিরোনাম 'অপঘাত'। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত কয়েকটি ঘটনাকে একটা ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক এ গল্পে। তবে নিছক ঘটনার বিবরণ দেওয়া ইলিয়াসের উদ্দেশ্য নয়, মুক্তিযুদ্ধে মানুষের সীমাহীন আত্মত্যাগের বিবরণও তিনি দিতে চাননি, তিনি ঘটনার চেয়ে ঘটনার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন বেশি এবং ঘটনা কীভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে, কীভাবে মিলিটারির ভয়ে ম্রিয়মাণ একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাবা সন্তানের কৃতিত্বে নিজেদের বিপদকে অগ্রাহ্য করে হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে, তা-ই তিনি দেখাতে চেয়েছেন নিজস্ব নিস্পৃহ-নির্মোহ ভঙ্গিতে।

বগুড়া জেলার আওতাধীন একটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলির ছেলে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়। বাড়ির দেড় শ গজের মধ্যে পাকিস্তানি আর্মির ক্যাম্প বসে। ফলে সন্তানের জন্য শোকগ্রস্ত মোবারক বা তার স্ত্রী কাঁদতেও পারে না। কিন্তু চেয়ারম্যানের ছেলে বুলুর বন্ধু 'শাজাহান' জ্বরে ভুগে মরার সময় কেবলি বুলু নাম বলেছে বারবার—এ ঘটনা ভীত মোবারকের মধ্যে নতুন বোধের জন্ম দেয়। ফলে যে একদিন বুলুর মৃত্যুর ঘটনা বুকে চেপে রেখেছিল, বৌকে কাঁদতে দেয়নি প্রাণের ভয়ে, যে একদিন বুলু ও মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে ভেবেছে, 'মরা ছাড়া তোরা আর কি বালটা ছিঁড়তে পারিস?' সে-ই সন্তানের কৃতিত্বে হঠাৎ গৌরব বোধ করে, সন্তানের সংগ্রাম ও ত্যাগকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং দেড় শ গজের মধ্যে মিলিটারির ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও সন্তানের যুদ্ধের কৃতিত্ব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রকাশ করতে শুরু করে। গল্পের শেষের দিকে মোবারকের জন্য স্ত্রীর দুশ্চিন্তা দেখে সে বিরক্ত হয়, ভাবে :

> যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয় নি সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কিভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে? (পৃ-৮৫)

শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ভীত পিতার উপলব্ধির এই রূপান্তর আমাদের বিস্মিত করে।

গ্রামের মানুষের মধ্যে নিরক্ষর চাষা কাবেজ ছাড়া কাউকে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কথা বলতে দেখা যায় না। ভীতি ও অবিশ্বাস এর প্রধান কারণ। তাদের ভাবনার মধ্যেই রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবিশ্বাস। নিজের স্কলার ছেলে শাজাহান যুদ্ধে চলে যাবে বলে চেয়ারম্যান শঙ্কিত, তার প্রশ্ন, 'গাদাবন্দুক আর দাও কুড়াল খন্তা লিয়া মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করবি, এ্যা?' চেয়ারম্যান নিজে পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে এখানে সাচ্চা মুসলমান ছাড়া কোনো হিন্দু বা মুক্তি নেই—মিলিটারিদের এ কথা বুঝিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি প্রবল অবজ্ঞা দেখিয়েও নিজের সন্তানের লাশ ক্যাম্পের সামনের রাস্তা দিয়ে গোরস্তানে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পায়নি। তার স্কলার ছেলে মারা গেছে চিকিৎসাবিহীন, জ্বরে, মুক্তিযোদ্ধা-বন্ধু বুলুর নাম জপতে জপতে। তার লাশ গোরস্তানে নিয়ে যেতে হয়েছে বাড়ির পেছনের জঙ্গল ও জলকাদাময় বিলের ওপর দিয়ে। এসব কাবেজের উপলব্ধিতে ধারণ করেছেন লেখক এভাবে :

> শবযাত্রীরা কলেমা শাহাদাত পড়ে, আর কাবেজ হলো জাহেল মানুষ, খোদার কালাম জানে না, সে কেবল জপে যে, বুলুর সঙ্গে তখন শাজাহান যদি চলে যায় তো আজ কি তার এতো কষ্ট হয়? (পৃ-৮১)

শাজাহানের মৃত্যুর পর পাকিস্তানি আর্মির এমনতরো ব্যবহারে সবার মধ্যে যে ভয় জাগে, কাবেজ সে ভয়কে অগ্রাহ্য করে। লেখক দেখাচ্ছেন নিরক্ষর এবং পাগলাটাইপের লোক বলেই কাবেজের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। সুস্থ মানুষ প্রাণের ভয়ে ম্লান ও মৃত। এই নিরক্ষর চাষার ভেতর দিয়ে লেখক মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আস্থা ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মনে পড়ে 'মিলির হাতে স্টেনগান' (*দুধভাতে উৎপাত*) গল্পে পাগল বলেই আব্বাস যুদ্ধোত্তর কালে নতুন শত্রুদের মারার জন্য স্টেনগান খুঁজত। সুস্থ হওয়ার পর তাকে দেখেছি ইন্ডেন্টিং ফার্মে কাজের ধান্দা করতে।

মুক্তিযুদ্ধে নিহত বুলুর কাঁদতে না পারা মায়ের বেদনাকে ইলিয়াস গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। শাজাহান তার মায়ের সামনে মরেছে :

> মাও তো তার ব্যাটাক জান ভর‍্যা দেখ্যা লিবার পারলো! আর হামার বুলু কোটে কার গুলি খায়া মুখ থুবড়্যা পড়্যা মলো গো, ব্যাটার মুখকোনা হামি একবার দেখবারও পারলাম না গো! হামার বুলুর উপর গজব পড়ে কিসক গো? বুলু অপঘাতত মরে কিসক গো?...আল্লার বিচার ক্যাঙকা কওতো? (পৃ-৬১)

নির্দোষ সন্তানের মৃত্যুর বেদনা, মৃত ছেলের মুখ দেখতে না পারার জ্বালা এবং মৃত ছেলের জন্য কাঁদতে না পারার নিদারুণ কষ্ট বুকে নিয়ে জেগে ওঠা বুলুর মায়ের এই জিজ্ঞাসা কেবল ছড়িয়ে পড়ে উত্তরহীন। শাজাহানের মৃত্যুতে সে বুক ভরে কাঁদে; এ কান্নার ভেতর দিয়ে মূলত বুলুর জন্য জমে থাকা কান্নাকেই উগরে দেয়। মোবারকের ভাবনায় তা স্পষ্ট হয়, বুলুর জন্য বুলুর মাকে মোবারক কাঁদতে দেয়নি, আজ :

> বৌকে থামাবার কোনো ইচ্ছা তার নাই। কাঁদবার এরকম সুযোগ বুলুর মায়ের কতদিন জোটেনি, আবার কবে জোটে কে জানে? (পৃ-৬৮)

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কথাসাহিত্যিকদের নিকটতম ঘটনা বলে, এবং গভীর জীবনবোধ, জীবনোপলব্ধি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির অভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প লিখতে গেলে সাধারণত তা কোনো বিশেষ মাত্রা লাভ করতে পারে না, গতানুগতিকতায় পর্যবেসন মানে। ঘটনার অবিশ্বস্ত বিবরণও এর জন্য দায়ী। কিন্তু ইলিয়াস কেবল ঘটনার বিবরণ না দিয়ে ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে গল্পটিকে গতানুগতিকতার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। গল্পটি শুরু হয়েছে শাজাহানের মৃত্যুর পর তার মায়ের কান্না এবং অদূরে মোবারক ও তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। শাজাহানের মৃত্যু-উত্তর ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে মোবারকের স্মৃতিভাবনার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে মিলিটারির আগমন, শহর থেকে আসা মানুষের প্রাণপণ পালানো, মিলিটারির গ্রাম জ্বালানো, নির্বিচার হত্যা, নিজের এবং চেয়ারম্যানের যুবতী মেয়েকে নিরাপদ স্থানে পাঠানো—এসব দৃশ্য ও প্রসঙ্গ। এর মধ্যে মোবারকও আর দশজন মানুষের মতো ভীত-সন্ত্রস্ত থেকেছে, কিন্তু শাজাহান মৃত্যুর সময় বারবার মুক্তিযোদ্ধা-বন্ধু বুলুর কথাই উচ্চারণ করেছে—এ কথা জানার পর তার চৈতন্যোদয় হয়, তার নবজন্ম ঘটে। বুলুর জন্য বারবার গর্ব করে কাবেজ, কিন্তু সে জানে না বুলুর কৃতিত্বময় মৃত্যুর কথা, ভয়ে মোবারক এ কথা কাউকেই বলতে পারেনি; এবার সে বুলুর কৃতিত্বের কথা, গৌরবময় মৃত্যুর কথা প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুলু দুজন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করে আর্মির গুলিতে শহীদ হয়েছে, এ ঘটনায় সে রং ছড়ায় বিটলুর বাপের কাছে : 'হামার বুলু বলে একো গুলিত মটোর ভরা মিলিটারিক শ্যাষ করিছে সেই বিত্তান্ত জানিস?'

স্থানীয় কড়িতলায় মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকজন আর্মিকে 'সাফ' করেছে—এ ঘটনাও মোবারককে উদ্বুদ্ধ করে; মোবারকের এই রূপান্তর ও সাহস তাকে গল্পের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে এবং গল্পটি নতুনতর মাত্রা লাভ করে।

'অপঘাত'-এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা 'রেইনকোট' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে বলে এখানে সে সম্পর্কে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'রেইনকোট'[৪] গল্পে ভীতু, কেমিস্ট্রির লেকচারার নূরুল হুদা মিলিটারির ভয়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং যোদ্ধাদের প্রসঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, এসব বিষয়ে ভাবতেও ভয় করে। শালা মিন্টু তার বাসা থেকেই মুক্তিযুদ্ধে গেছে—এ তথ্য আড়াল করার জন্য ঢাকা শহরে সে চারবার বাসা বদল করেছে। তার কলেজের জন্য ১০টি আলমিরা কেনা হয়েছে, তার দায়িত্ব ছিল সেগুলোর মান পরীক্ষা করার। এগুলো যেসব কুলি বয়ে এনেছে, তাদের মধ্যেই ছিল মুক্তিযোদ্ধা, তারাই মিলিটারির ক্যাম্পের পাশের ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একজন ধরা পড়েছে এবং মিলিটারির অভিযোগ সে নূরুল হুদার নাম বলেছে, তার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগাযোগ আছে বলে উল্লেখ করেছে। মিলিটারির যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর নূরুল হুদা ঠিকই দিচ্ছিল, কিন্তু যখন জানল, কুলিবেশী মুক্তিযোদ্ধা বলেছে, নূরুল হুদা তাদের 'গ্যাঙের' একজন নিয়মিত সদস্য, তখন যে গৌরব বোধ করে, তার চেতনার রূপান্তর ঘটে, তার নবজন্ম হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানা নূরুল হুদা চেনে—মিলিটারির এ কথার উত্তরে সে বলে 'হ্যাঁ'। কিছুই না জানা সত্ত্বেও এই 'হ্যাঁ' জবাবের মধ্য দিয়ে সে নিজেই একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়। মিলিটারির সামনে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার যে বিপদের আশঙ্কা, তাকে সে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে। কল্পিত আস্তানার খবর তার কাছ থেকে বের করতে না পেরে মিলিটারিরা তাকে ছাদের আংটার সঙ্গে ঝুলিয়ে যখন তার পাছায় নিরন্তর চাবুক মারে, তখন এই আঘাতকে তার স্রেফ উৎপাত বলে মনে হয়। বৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধা-শালা মিন্টুর রেইনকোট গায়ে দিয়ে এসেছিল সে, চাবুকের আঘাতকে তার মনে হয় : 'যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইন কোটের উপর।'

মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আর্মি যে নিপীড়ন চালায়, মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও সে এই আঘাতকে গ্রহণ করে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সম্মানে অভিষিক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়—এই আনন্দ ও গৌরবে সে নিরন্তর বলে চলে মিসক্রিয়ান্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে।

ছদ্মবেশী কুলিদের যে আস্তানা সে চেনে, আমরা বুঝতে পারি, তার নাম বাংলাদেশ—যেখানে সব স্তরের, সব শ্রেণীর মানুষ মাটির জন্য লড়াই করছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সন্ত্রস্ত মানুষের এই যে নবচেতনা লাভ, এই জায়গায় 'অপঘাত' এবং 'রেইনকোট' অভিন্ন। পার্থক্য যা তা বাহ্যিক : অপঘাতের পটভূমি গ্রাম, রেইনকোটের পটভূমি নগর, প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা; অপঘাতে মোবারকের সন্তান মুক্তিযোদ্ধা, রেইনকোটে নূরুল হুদার শালা; বুলু শহীদ হয়েছে, মিন্টু বেঁচে আছে। তাহলে 'রেইনকোট' গল্প কি অপঘাতের সম্প্রসারণ মাত্র, এ গল্পে কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়নি—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। 'রেইনকোটে'র বিশেষত্ব এখানে যে, নূরুল হুদা নিজেই রূপান্তরিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধায়। মোবারকের গর্ব পুত্রের জন্য, নূরুল হুদার গর্ব সেই অজানা কুলিবেশী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য, অতঃপর তার নিজের জন্যও। সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে জেনেও সে একজন মুক্তিযোদ্ধা, বিভ্রান্ত মিলিটারির মুখ থেকে পাওয়া এই গৌরবটুকু সে হারাতে চায়নি। তার চেতনার এই দিকটিকে ইলিয়াস উপলব্ধি করেছেন।

'অপঘাত'-এ ইলিয়াসের নির্লিপ্তি অব্যাহত রয়েছে। সমস্ত ঘটনায় লেখক নীরব দর্শক, তার কৌতূহল আছে, সহানুভূতি নেই, আবেগ আছে, মোহ নেই। গুরুতর বিষয়ে কথা বলার সময়ও কখনো কখনো রসিকতার আভাস পাওয়া যায়। যেমন :

> ১. তার (মোবারকের) ভয় হয় যে লুঙ্গিতে প্রশ্রাবের ফোঁটা পড়েছে। একটু বাইরে গেলে হতো। কিন্তু এও তার জানা আছে যে বাড়ির পেছনে ভেরেন্ডা ঝোপে বসলে গুনে গুনে ৮ ফোঁটাও পড়বে কিনা সন্দেহ। (পৃ-৫৮)

শাজাহানের লাশ নিয়ে বিলের জল ও আলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় :

> ২. 'সাবোধান, খুব সাবোধান! দেখ্যাশুন্যা কদম ফালাও। কাদার মধ্যে পড়লে বিপদ হবি।' সবাইকে সাবধান করার দায়িত্ব পালনে মগ্ন হয়ে লোকটা নিজের বাত-চুম্বিত-চরণযুগলের প্রতি অবহেলা করে। কয়েক গজ মাত্র চলার পর ৭ম কি ৮ম সাবধানবাণী সম্পূর্ণ নিঃসৃত হবার আগেই তার মোটাসোঁটা ডান পা আল থেকে পড়ে যায় নিচে। (পৃ-৭৭-৭৮)

ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলতে ইলিয়াস পছন্দ করেন, গভীর হালকা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চান তিনি। 'উৎসব' ও 'প্রতিশোধ' গল্পে তা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কিন্তু এখানে মৃত সন্তানের ঘরে মিলিটারিদের ভয়ে প্রস্রাব চলে আসা এবং বাইরে গিয়ে যে '৮ ফোঁটাও' পড়বে না—এসব কথা অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দুর্দশাকে লেখক নিজেই হাস্যকর করে তুলেছেন (দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে)। যে লোক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে, তাকেই যে আগে পড়ে যেতে হবে আল থেকে, এবং তার পা হবে বাতগ্রস্ত,

মোটা— এমন কোনো কথা নেই। বাত-চুম্বিত-চরণযুগলের প্রতি অবহেলা—এসব শব্দবন্ধ স্পষ্টতই রসিকতার ইঙ্গিত দেয় এবং এসব গল্পে সৃষ্ট বিষয়ানুগ পরিবেশকে কখনো কখনো ভেঙে দেয়।

ইলিয়াস নিখুঁত এবং বিস্তারিত বর্ণনায় স্বস্তি পান। তাতে তাঁর নিপুণ পর্যবেক্ষণক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেসব চাষা শাজাহানের লাশ নিয়ে যাচ্ছিল তাদের সম্পর্কে :

> এরা মাঠে মাঠে কাজ করে বলে মাঠ এদের বেশ পোষা, মাঠের নাড়ি নক্ষত্র এদের মুখস্ত। ধান গাছের গোড়ার একটু ওপর এমন করে পা ফেলবে যে একটুখানি হেলে ধানগাছ অনেকটা পাপোশের কাজ করবে। কাদার কামড় থেকে এই ভাবে বাঁচতে হয় আবার দেখতে হয় ধানগাছ যেন একেবারে চিরকালের মতো শুয়ে না পড়ে। অতো দ্যাখাদেখির দরকার পড়ে না, তাদের পায়ের সঙ্গে মাঠ ও কাদার বোঝাপড়া ভালো, সহজে কেউ কাউকে ঘাটায় না। (পৃ-৭৭)

এভাবে লেখক কৃষকদের একটা চেহারা উপস্থিত করেছেন। এই ডিটেইলিং, স্মৃতিবর্ণনা, আর্মির ধ্বংসচিত্র, তার প্রতিক্রিয়া বর্ণন এবং মোবারকের নবচেতনা লাভ—সব মিলে 'অপঘাত' কেবল ইলিয়াসের গল্পগুলোর মধ্যে নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গল্পের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

প্রবল যন্ত্রণা ও দুর্বিষহ জীবনের ভেতরও মানুষের বেঁচে থাকার স্পৃহা শেষ হয় না, 'দোজখের ওম' গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানুষের এই বেঁচে থাকার স্পৃহাকে উপলব্ধি করেছেন। পুরো গল্পটি শরীরের অর্ধেক অচল বৃদ্ধ কামালউদ্দিনের স্মৃতি-স্বপ্ন-অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার বিবরণে অক্লান্ত, এতে ধরা পড়েছে পুরান ঢাকার একটি পরিবারের প্রায় পৌনে এক শ বছরের ইতিহাস। নোংরা জীবন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কৃত্রিম সম্পর্ক, সামাজিক মানুষের মধ্যে পরস্পরের অভ্যন্তরের শত্রুতা ও স্বার্থপরতা, মুক্তিযুদ্ধ, অতিলৌকিক বিশ্বাস, অবৈধ অর্থ উপার্জনকারীদের সঙ্গে পীরের সম্পর্ক, সমকামের মধ্য দিয়ে প্রথম যৌন-অভিজ্ঞতা, মানবিক দুর্বলতা, একই পরিবারের ভেতর একের মধ্যে অন্যকে বঞ্চিত করার মানসিকতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির ভাষাচিত্র হয়ে উঠেছে গল্পটি। পাঁচ বছর যাবৎ কামালউদ্দিন নিশ্চল, দুই বছর তার 'গু-মুত' টেনে স্ত্রী হঠাৎ মরে গেছে। সর্বশেষ মরেছে বড় ছেলে আকবর। স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত কন্যা খোদেজা ও তার ছেলে আবু বকর এখন তার সেবা করে। কামালউদ্দিন আবিষ্কার করে, মারা গেলে ভাইয়ের সংসার থেকে খোদেজাকে বিতাড়িত হতে হবে—এই ভাবনার

কারণেই খোদেজা বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কামালউদ্দিনের ভাবনা লেখক এভাবে প্রকাশ করেন :

> আধখানা অচল শরীরের ভার ও বাকি আধখানা সচল শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে এবং বৌ ছেলে মেয়ে নাতি—একেকজনকে চোখের সামনে পট পট করে মরে যেতে দেখেও বয়সের নিয়ম কানুন অস্বীকার করে বেঁচে থাকাটা যে কতো মজার—'বাপের জন্য একটু মায়ামহব্বত থাকলে মেয়ে সেটা ঠিকই বুঝতো'। (পৃ-৯১)

পৃথিবীকে কামালউদ্দিনের মনে হয় হাবিয়া দোজখ, আল্লা তাকে এখনি উঠিয়ে নিক—এই তার চূড়ান্ত মোনাজাত, তা সত্ত্বেও তার স্বার্থচিন্তা প্রখর; তার স্বার্থচিন্তা ও মৃত স্ত্রীর প্রতি বিরক্তি যায় না। খোদেজার কান্না শুনে ভাবে, 'তবে কি আবু বকর মারা গেলো? তাহলে এখন আমার গুমুত ধোবে কে?' পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় সন্তানের জন্ম দেওয়ায় স্ত্রীর ওপর সে বিরক্ত, তার ক্রোধ, 'আকবরের মা আর বাচ্চা বিয়াবার টাইম পায় নাই?' তার অল্পবয়স্ক নাতনিকে বহন করতে দেখি কামালউদ্দিনের মতো স্বার্থচিন্তা, 'নানা তুমি মরলে এই ঘরে থাকুম আমি আর আপা। আমাগো ঘরে কেমুন গরম!'

কামালউদ্দিন মানসিকভাবেও অসুস্থ, তার অবস্থান সুস্থতা এবং অসুস্থতার মাঝামাঝি। রাতে ঘুমালেই সে মৃত স্ত্রীকে দেখতে পায় ঘরের মধ্যে, যে তাকে দুনিয়াপ্রীতির জন্য আঘাত করে তীব্রভাবে :

> অহনতরি দুনিয়ার লালচ তোমার গেলো না। দোজখের কীড়া, দোজখের লাহান ঘরের মধ্যে থাকো, তয় কি গতরখান উঠাইবা না। (পৃ-৯৪)

সে উপলব্ধি করে পাপ-পুণ্যের হিসাবে তার পাপের বোঝা ভারী, তা সত্ত্বেও নিজের কাছে নিজের পাপ-পুণ্যের ব্যাখ্যা উপস্থিত করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিবারের নতুন নতুন ঝঞ্ঝাট, বিভিন্ন সমস্যা-ভাবনায় কাতর হয়ে পরমুহূর্তেই কামালউদ্দিন ভাবে, 'তার কি? আল্লা তার কথা শুনলে এই দোজখে তার কদিনই বা মেয়াদ?'—কিন্তু লেখক তার দীর্ঘ স্মৃতি-ভাবনা ও স্বপ্নের বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মৃত্যুর জন্য সকাল-সন্ধ্যা আল্লার কাছে মোনাজাত করলেও মরার ইচ্ছা তার ছিল না। 'অহরতরি দুনিয়ার লালচ তোমার গেলো না'—এ অভিযোগ তো তার মৃত স্ত্রীর নয়; এ অভিযোগ তার হৃদয়ের গোপনতম ইচ্ছার প্রতি তার নিজের চেতনসত্তার। এ ধরনের অসুস্থ একজন মানুষের বাঁচা-মরার ক্ষেত্রে নিজের যদিও করার কিছুই থাকে না, তবু কামালউদ্দিনের ভেতর অসুস্থতা থেকে জাত মৃত্যুচিন্তা ও পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণের কারণে বাঁচার আগ্রহ—এ দুয়ের

যে দ্বন্দ্ব, সে দ্বন্দ্বকে সে ভাবনার মধ্যে স্পষ্ট হতে দেয়নি এবং না দেওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু অনিবার্যভাবে ক্রিয়াশীল সে দ্বন্দ্ব পাঠকের গোচরে চলে আসে। তার মধ্যে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'হানিফের মা ভাবী'র আগমনের পর। অনেককে দেখে চিনতে, কথা শুনতে, বুঝতে কামালউদ্দিনের বেশ সময় লাগলেও দীর্ঘদিন পর ছেলের কুলখানিতে আসা হানিফের মা ভাবীর কণ্ঠ শনাক্ত করতে তার অসুবিধা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে যৌবনকাল থেকে এই মহিলার প্রতি কামালউদ্দিনের ছিল প্রবল আকর্ষণ, বিবাহিত অবস্থায় একবার সে এই বিধবা মহিলাকে বিয়ে করার কথাও ভেবেছিল মুহূর্তের জন্য,[৫] কিন্তু সে নির্দ্বন্দ্ব হতে পারেনি; এই মহিলার প্রতি আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে, নিজেকে স্থির করতে একদিন সে দৌড়ে গিয়েছিল পতিতালয়ে, জীবনের একেবারে শেষ সময়ে এলেও সেই আকর্ষণ তার কমেনি। এতদিন পর হানিফের মা ভাবীর 'তুমি বাঁইচা আছো!'—এই একটি বিস্ময় তার বাঁচার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করে; জীবনকে সে উপলব্ধি করতে শুরু করে নতুনভাবে। নিজের সমস্ত সওয়াব কেটে নিয়ে কবরের আজাব কামনা করে আল্লার কাছে পৃথিবী নামক হাবিয়া দোজখ থেকে সে মুক্তি চেয়েছিল; সে এখনো বাড়ির মুরব্বি—এ কথা মনে রেখেও সে ভেবেছে, ঘরে চুরি হলে, ছোট ছেলে তার বড় ছেলের বউ-মেয়েদের তাড়িয়ে দিলে তার কী। কিন্তু হানিফের মা ভাবীর বিস্ময়ের মধ্যে আনন্দ ছিল, সে যে এতকাল অপেক্ষা করেছে কেবল তার জন্য, এতে জীবনের প্রতি তার বিস্বাদ পরিণত হয়েছে অমৃতে। ফলে সে যুগপৎ লাঠি ও নাতনির ওপর ভর দিয়ে ভাবীর সামনে দাঁড়ানোর এবং ভাবীর বিস্ময়ের উত্তরে এ কথা বলার শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে যে, 'বাঁচুম না ক্যালায়।' লালা-বলকানো হুঙ্কার ছেড়ে নাতনিকে লক্ষ করে স্বার্থপর সন্তানের উদ্দেশে এ কথা বলতেও সে ভোলে না, 'তর চাচারে কইস, দাদায় অহনতরি বাঁইচা আছে।'

ইলিয়াসের গল্পে আমরা দেখেছি, ক্ষুধা-মৃত্যু-স্বার্থপরতা হাত-ধরাধরি করে আসে। প্রেম-ভালোবাসা-স্নেহ-মমতা—বাংলা গল্পের বহুচর্চিত এসব বিষয় থেকে সযত্নে দূরে থাকতেও তাঁকে আমরা দেখেছি। ক্ষুধা-মৃত্যু-স্বার্থপরতা-ভণ্ডামির পাশাপাশি জীবনের এসব মৌল প্রত্যয়ও উপস্থিত থাকে, যেটি অচল অবসন্ন, জীবনের উপান্তে স্থির একজন বৃদ্ধের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস উপস্থিত করেছেন। ফলে বহুচর্চিত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও এই মানবিক টান ব্যঞ্জনার্থ পেয়েছে, ভিন্নতর উপলব্ধির জন্ম দিয়েছে।

অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬) গ্রন্থের 'ফেরারী' গল্পের সঙ্গে এ গল্পের বহুবিধ সম্পর্ক রয়েছে। স্বার্থপরতা-ভণ্ডামি-অলৌকিক বিশ্বাস উভয় গল্পের উপজীব্য। মৃত্যুপথযাত্রী ইব্রাহিম ওস্তাগর এবং অচল কামালউদ্দিন—দুজনেই পৌঁছেছে জীবনের উপান্তে, দুজনেই মৃত বউকে ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখে। দুজনের মাধ্যমেই লেখক বিশ্লেষণ করেছেন স্বপ্ন ও স্মৃতি। তা সত্ত্বেও 'দোজখের ওম', 'ফেরারী' গল্পের বিষয়-আশয়ের নিছক পুনরাবৃত্তি বা সম্প্রসারণ নয়। ইব্রাহিম ওস্তাগর সম্পূর্ণ উন্মাদ, মৃত্যু তার পরিণতি; 'ফেরারী' গল্পের বিশেষত্ব ওস্তাগরের স্মৃতিবর্ণনা বা তার মৃত্যুতে নয়, নোংরা জীবন থেকে তার সন্তান হানিফের পলায়ন এবং থানায় আশ্রয়গ্রহণের প্রতীকী আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। পক্ষান্তরে, 'দোজখের ওম' পুরোপুরিই কামালউদ্দিনের মনোবিশ্লেষণ; এই গল্পের বিশেষত্ব জীবনের শেষলগ্নে উপস্থিত কামালউদ্দিনের দুর্বার জীবনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত কামালউদ্দিনের মানসিকতা অসুস্থতাও কম নয়, তাই তার ভেতর দিয়ে ঘটনার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখককে ঘটনাগুলোর শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়েছে। কামালউদ্দিনের স্মৃতি, স্বপ্ন ও ঘটনার বর্ণনায় ৩৩ পৃষ্ঠার এই গল্পে ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী কোনো স্তবক নেই, নিরন্তর অগ্রসরণ আছে। এর মধ্যে কামালউদ্দিনের ভাবনা-বিশ্লেষণ কখনো কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বাপের মুখ থেকে শোনা পীরের জীবনবৃত্তান্ত, তার স্বেচ্ছামৃত্যু, ছেলের বাল্যকাল, কৈশোরে হাসমত ওস্তাগরের সঙ্গে সমকামের ভেতর দিয়ে প্রথম যৌন-অভিজ্ঞতা, জীবনব্যাপী মানুষের লুঙ্গি আর 'বালিশের অর' বানানোর অভিজ্ঞতার কথা শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে যে ভাবতে পারে, তার পক্ষে যৌনসঙ্গীর নাম বা বড় ছেলের শিশুবেলার মুখ মনে করতে না পারা অস্বাভাবিক। 'গতর আধখানা বিকল হলে কী হয়, দুনিয়া বোঝার জন্য তার সচল আধখানা মগজই যথেষ্ট'—এ কথা যার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই কামালউদ্দিন সম্পর্কেই আবার বলা হয়েছে, আকবরের শিশু অবস্থার চেহারা মনে করা কি তার আধখানা মগজের কর্ম? দীর্ঘ বিশ্লেষণে পাঠকের কাছে এসব একটু অস্বাভাবিকই ঠেকে। মানসিকভাবেও সে কিছুটা ভারসাম্যহীন—এই যুক্তি পাঠকের এ অভিযোগ খণ্ডাতে পারে না, কারণ কামালউদ্দিনের দীর্ঘ স্মৃতিবর্ণনায় তার মানসিক অসুস্থতার তুলনায় ভারসাম্যহীনতা ন্যূন। তা সত্ত্বেও কামালউদ্দিনের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা এবং পুরোনো ঢাকার উপভাষার প্রবণতাযুক্ত দীর্ঘ ভাবনা পাঠককে তার অনুভূতি ও ঘটনার সঙ্গে একাত্ম করে। কামালউদ্দিনের নোংরা নিশ্চল জীবন দেখতে

দেখতে যে পাঠক জীবনের শূন্য দিকটি উপলব্ধি করেন, কামালউদ্দিনের বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সেই পাঠকই উপলব্ধি করেন জীবনের অগাধ সম্ভাবনাকে। এই সম্ভাবনাটুকু আছে বলেই মানুষ বেঁচে থাকে, জেগে ওঠার প্রেরণা পায়, এ কথা কামালউদ্দিনের জন্য যেমন সত্য, তেমনি সব মানুষের জন্যও। এই বোধ একদিকে লেখকের শক্তির ইঙ্গিতবহ, অন্যদিকে তাঁর জীবনোপলব্ধির গভীরতা ও সম্পূর্ণতার দ্যোতক।

তথ্য-সংকেত

১. *দোজখের ওম* (১৯৮৯) ইলিয়াসের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ। এতে রয়েছে ৪টি গল্প : ১. কীটনাশকের কীর্তি, ২. যুগলবন্দি, ৩. অপঘাত ও ৪. দোজখের ওম।

২. 'চাটুকারিতার সময় তার প্রধান ইন্দ্রিয় জিহ্বা রূপান্তরিত হয় একটি ল্যাজে, লোমহীন ছোট ল্যাজ মুখগহ্বরের ধ্বনিপুঞ্জে কি কারুকাজ করে' : *অন্য ঘরে অন্য স্বর*, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃ-১৭।

৩. অন্যটির নাম 'রেইনকোট', প্রথম প্রকাশ; *মাটি*, গল্পসংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, ঢাকা। (পরে, ৫ম গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*-এ গৃহীত ১৯৯৬, ঢাকা, 'অপঘাত' ও 'রেইনকোট'—গল্প দুটির সূচনা ও সমাপ্তি মুক্তিযুদ্ধের ভেতরে। তাই 'অপঘাতে'র সঙ্গে 'রেইনকোট' আলোচিত হলো।

৪. রচনাকাল জুন-জুলাই ১৯৯৫। *মাটি*, প্রাগুক্ত।

৫. 'সেই সময় (আকবরের মার বাচ্চা হওয়ার সময়) একবার, না খুব অল্পক্ষণের জন্য তার মনে হয়, আকবরের মা মারা গেলে এই হানিফের মা ভাবীকে নিয়ে সে ফের নতুন করে বাঁচতে পারে। না, না, ঠিক এরকম ভাবে নাই। তাই কি হয়, না হওয়া উচিত?' (পৃ-১০১) সে যে ভেবেছিল তা ঠিক, কিন্তু এখন ভাবনার ঔচিত্য নিয়ে সে ভাবছে।